কথামৃত-কথা

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-অবলম্বনে)

স্বামী সত্যানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন,
২নং প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন,
কলিকাতা—৭০০০৩৬

প্রকাশক :—স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ
জেনারেল সেক্রেটারী
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন,
২নং প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন,
কলিকাতা—৭০০০৩৬

প্রথম সংস্করণ

১৫ই ভাদ্র ; ১৩৭৩ জন্মাষ্টমী,

—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন,
২নং প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, কলিকাতা—৭০০০৩৬
ন্যাশানাল পাবলিশিং হাউস,
৫১সি কলেজষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০৭৩
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার,
৩৮নং বিধান সরণী, কলিকাতা—৭০০০০৬
সংস্কৃত বুক ডিপো,
২৮।১, বিধান সরণী, কলিকাতা—৭০০০০৬
মহেশ লাইব্রেরী,
২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০৭৩

মুদ্রাকর ঃ
মনোরঞ্জন পান
নিউ জয়কালী প্রেস,
৮/এ দীনবন্ধু লেন,
কলিকাতা—৭০০০০৬

নিবেদন

ভারতবর্ষ বিশেষতঃ বাংলাদেশের সৌভাগ্য যে, মহাপুরুষগণের শ্রীচরনারবিন্দ-স্পর্শে দেশের ভূমি পুনঃ পুনঃ বিশুদ্ধি লাভ করে। যখনই অবিশ্বাস ও মলিন ভোগ স্পৃহা দেশের বাতাবরণকে কলুষিত করে তখনই কোন লোকোত্তর মহাপুরুষেয় আবির্ভাবে এবং তাঁহার দিব্য দেহস্পর্শে বিশোধিত হয় আধ্যাত্মিক বায়ুমণ্ডল। আমার অবিকম্পিত বিশ্বাস যে ভারতবর্ষের অধ্যাত্মবিভূতি কখনই জড়বাদ ও ভোগবাদের দ্বারা অভিভূত হইবে না' তাহার প্রমাণ লোকাতিগ জ্ঞানবৈরাগ্য-প্রেমময় অপরোক্ষানুভূতিসম্পন্ন ধর্মপ্রবক্তা পুনঃ পুনঃ ভারতভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তাঁহাদের সংস্পর্শে যাঁহারা আসিবেন বা তাঁহাদের বাণী শ্রদ্ধার সহিত অধ্যয়ন কবিবেন ও মনন করিবেন তাঁহারা এই মহাপুরুষদের আধ্যাত্মিকতার উষ্ণস্পর্শ অতিক্রম করিতে পারিবেন না।

মহাপুরুষদের বাণীর মধ্যে যে একটি ঐক্য, আধ্যাত্মিকতার প্রতিষ্ঠা, দিব্যভাব প্রতিষ্ঠা বিরাজমান তাহা অনস্বীকার্য। কিন্তু বৈশিষ্ট্যও বিরাজমান। এই বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন আছে। বিচিত্ররুচি মানবের বিচিত্র সমস্যা ও সংশয় নব নব আকার ও প্রকারে উদিত হইয়া তাহাকে যখন পীড়িত করে, অভিভূত করে, বিভ্রান্ত করে ; যখনই দুঃখ-দারিদ্র, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থা, প্রমাদ ও অবিচার মানবচিত্তকে বিদ্রোহী ও ব্যাকুলিত করে এবং তাহার প্রতিক্রিয়ারূপে জাগতিক কল্যাণের মৌলিক আধারের প্রতি তাহার চিত্ত অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধায় কলুষিত হয় তখনও এইরূপ অধ্যাত্মপ্রেরণার নবীনরূপে সৃষ্টির আবশ্যকতা দেখা দেয়।

ভারতবর্ষে এক চরম দুর্দিনে ধর্মের গ্লানির সংকট মুহূর্ত্তে নেমে এসেছিলেন করুনার প্লাবনে মহাসমন্বয়মূর্ত্তি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব। বিজ্ঞানের আলোয় মানুষের মন তখন একদিকে জড়বাদে সমাচ্ছন্ন, অন্যদিকে সন্দেহ ও অবিশ্বাসে পথহারা। এই পথহারাদের পথের দিশারী হতে হলে এদের মতই হতে হয়, তাই ঠাকুর বিজ্ঞানের দৃষ্টি নিয়ে ভগবৎ-প্রাপ্তির পথ দেখাতে সুরু করলেন। শুধু ব্যাকুলতাই হল সম্বল-শুধু চোখের জলে ভরা হল মঙ্গল ঘট। নিজের জীবন বলি দিয়ে কেনা হল মার আশিষ। এমনি করে সব প্রধান প্রধান ধর্ম মতের সাধনে সিদ্ধ হয়ে যখন অদ্বৈতসিদ্ধিতে মন অখণ্ডের ঘর থেকে আর

নামতে চায় না, সেই সময় মাই আবার নামিয়ে আনলেন বিশ্বের কল্যাণে, অখণ্ড হতে খণ্ডের রাজ্যে···বললেন ভাবমুখে থাক্।

কাণ পেতে যে কল্যাণ বাণী শুনতে চেয়েছিল বিশ্ব, সেই বাণী মা নিজেই শুনিয়ে গেলেন—ওরে তুই ভাবমুখে থাক্। এমনি করেই কি ভাববাদের (আইডিয়ালিজিম) প্রতিষ্ঠা হল উনবিংশ শতকের জগতে। এমনি করে তিনবার মা'র আদেশে মায়ের দুলাল নামলেন সমাধির সপ্তলোক হতে···মরুর বুকে নেমেছিল কণ্ঠভরাতৃষাহরা অমৃতবরিষণ · যার কৃপাধারে শুধু বাংলা নয়, শুধু ভারত নয়, সমস্ত বিশ্ব অমৃতায়িত হচ্ছে। বিশ্বের উর্দ্ধে যেসব লোক আছে সেখানেও চলেছে হর্ষ প্লাবন ·আজ লোকে লোকেবসেছে নববোধনের মঙ্গলঘট আর আগমনীর মিলন মাঙ্গলিকে দিক দিক দেশ দেশ হচ্ছে অনুরণিত। (যুগে যুগে যার আসা)

শ্রীরামকৃষ্ণবাণী-মাভবতারিণীর বাণী—অপ্রাকৃত বাণী। যেমন ভাববাহী তেমন জ্ঞানবাহী দুইই শুধু সাধুদের জন্যই'ত নয়, সকলের জন্য বটে। ঠাকুর যে সবার ঠাকুর. সবার মত করে বলেছেন বলেই তো এত mass appealing হয়েছে।

এ শাশ্বত সার্ব্বভৌম বাণীর মর্মোদ্ধার করতে সমর্থ কে ? কে ইহার রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারে ? যাঁর জীবন একেবারে হারা হইয়াছে তাঁরই পরম আরাধ্যদেবতা ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেবের জীবনধারায় তিনিই ত একমাত্র সমর্থী পুরুষ।

শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দজী এরূপ একজন ঈশ্বরজানিত মহাপুরুষ যাঁহার সমগ্র জীবনব্যাপীমহাসাধনায় দেখা যায় যে, বর্ত্তমান ভোগোন্মত্ত পৃথিবীতে সমাজের মধ্যে মহাকোলাহলমুখর নগরীর ও শহরের বুকে থেকে আবাল্য অসাধ্য সাধনায় নিমগ্ন এক মহাজীবন—যেন ভোগমুখী প্রকৃতির এক বিরাট প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্বরূপ।

যাঁর সমগ্র জীবনে মহাব্রতস্বরূপ ছিল এই তপশ্চর্য্যা। সর্বাবস্থাতে এই তপস্যাকে অবলম্বন করে জীবনের পরম সত্যকে জানবার জন্যে অন্তস্থঃ হয়ে চলেছেন এই মহাযোগী—যেন উপনিষদবর্ণিত তপব্রহ্মের মূর্ত্ত বিগ্রহ হয়ে।

বীরভূমজেলার সিউড়ীর পৈতৃকবাটীতে একাকী রহসিস্থিত হয়ে কখনও বা অর্দ্ধাহারে কখনও বা অনশনে চলেছে জগৎজননীকে পাওয়ার এক অতন্দ্র সাধনা। তাঁরই ইষ্ট দেবতা শ্রীশ্রীঠাকুর পরমহংসদেবের জীবনের সেই জ্বালাময়ী উৎকণ্ঠা, বিরহের সেই অসহ্য জ্বালা, মিলনের সেই আনন্দ-

মাধুর্য্য লাভের আত্যন্তিক আকুতি নিয়ে শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দজী দীর্ঘ ১৫ বৎসর কাল তাঁর জীবন-মরণ সাধনায় রত ছিলেন। যার ফলে তাঁর জীবনধারা একেবারে তাঁর পরমারাধ্য দেবতার জীবনধারায় হারা হয়ে যায়। তাই দেখা যায় পরবর্ত্তীকালে আশ্রমে নিত্যদিন স্বাধ্যায়ে তিনি শুধুমাত্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের মহাবাণীর মর্মোদঘাটনে চেষ্টিত ছিলেন না, ইহাকে নানাভাবে অর্থাৎ বিজ্ঞানের আলোকে, দর্শনের আলোকে, নীতিবিজ্ঞানের আলোকে, মনস্তত্ত্বের আলোকে বিভিন্ন দিক দিয়ে আধুনিকযুগসম্মত ব্যাখ্যা তিনি পরিবেশন করিতেছেন যা'তে বর্ত্তমানে সংশয়বাদী ও যুক্তিবাদী মানুষের কাছে ইহা উপভোগ্য হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণমহাবাণীর উপরে ইহা এক নূতন আলোকপাতের প্রচেষ্টা।

বর্ত্তমান 'কথামৃত-কথা' গ্রন্থখানি ইহারই নিদর্শন। শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দজীকৃত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণমহাবাণীর ভাষ্যের সবগুলি ধরে রাখা সম্ভব হয়ে উঠে নি; তবে যেটুকু তাঁর কৃপায় ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে সেগুলি সংগ্রথিত করেই প্রকাশিত হল এই "কথামৃত-কথা"। ইহার উপাদান প্রধানতঃ সংগ্রহ করা হয়েছে শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দজী রচিত বেদছন্দা নামক পাঁচখণ্ড গ্রন্থ হতে এবং সঙ্কলয়িত্রী সন্ন্যাসিনী সাধনাপুরী মাতার 'শ্রবণমঙ্গলম' নামক চার খণ্ড সঙ্কলন গ্রন্থ হতে। আরো কিছু সাহায্য নেওয়া হয়েছে স্বামী শক্ত্যানন্দ মহারাজ ও ব্রঃ ব্রত চৈতন্য মহারাজের ডায়েরী হতে।

শেষে দু'টী পরিশিষ্ট আছে। প্রথমটিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী ছাড়া শ্রীশ্রীমায়ের ও স্বামীজীর কিছু বাণীর ব্যাখ্যা আর দ্বিতীয়টীতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণমহাবাণীর ভাবাবলম্বনে সঙ্গীত যাহা সকলের কাছে বিশেষ করে সঙ্গীতপিপাসুদের কাছে খুবই হৃদয়গ্রাহী হবে।

পরিশেষে উল্লেখযোগ্য যে শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দজীর আশ্রিত সন্তান শ্রীনিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় "কথামৃত-কথা" গ্রন্থের মুদ্রণকার্য্যের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন। তিনি (ব্রঃ নিরঞ্জন চৈতন্য) বর্ত্তমানে আমাদের আশ্রমের সাঁইথিয়া অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা কার্যে রত আছেন। আমাদের নিউ জয়কালী প্রেসও এ বিষয়ে সাধ্যমত সাহায্য করেছেন। আমরা ইঁহাদের সকলের দীর্ঘ কল্যাণময় ও সুস্থ জীবন কামনা করি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

“ঈশ্বর আছেন, তাঁর সৃষ্টি দেখলে বোঝা যায় ।” ১—৭
“ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। ভগবান এই জগৎব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে এরই মধ্যে রয়েছেন। তিনি জগতের আধার আধেয় দুই-ই। বেদে আছে ঊর্ণনাভের কথা, মাকড়সা আর তার জাল। মাকড়সা তার নিজের থেকে জাল বার করে, আবার সেই জালেই থাকে ।” ৭
“ঈশ্বরই বস্তু ।” ৭—৮
“ঈশ্বর শিশু স্বভাব ।” ৮—৯
“ঈশ্বর কল্পতরু-প্রার্থনা কর-তিনিই মনোবাঞ্ছা পূরণ করবেন ।” ৯—১১
“ভগবান কল্পতরু, তাঁর কাছে চাইতে হয় ।” ১১—১২
“তিনিই মন বুদ্ধি অহংকার চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন ।” ১২—১৩
“তিনিই পুরুষ তিনিই প্রকৃতি ।” ১৩
“তিনি যেন চুম্বক আর ভক্ত যেন ছুঁচ, আবার ভক্ত কখনো হন চুম্বক আর ভগবান হন ছুঁচ ।” ১৩—১৪
“এখান থেকেই সব ।” ১৪—১৫
“ঈশ্বর সম্বন্ধে যে যতটুকু দেখেছে সে মনে করেছে ঈশ্বর এমনি আর কিছু নয় ।” ১৫
“নিত্য ঈশ্বর নিত্য ধাম ।” ১৬
“এমন জায়গা আছে, যেখানে বরফ গলেনা স্ফটিকের আকার ।” ১৬
“কি রকম জান, যেন সচ্চিদানন্দ সমুদ্র। কুলকিনারা নাই। ভক্তিহিমে সেই সমুদ্রের স্থানে স্থানে জল বরফ হয়ে যায়, যেমন জল বরফ আকারে জমাট বাঁধে অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি সাক্ষাৎ হয়ে কখন সাকাররূপে দেখা দেন, আবার জ্ঞান সূর্য্য উঠলে সে বরফ গলে যায় ।” ১৭

"কেউ কেউ মনে করে বেশী ঈশ্বর ঈশ্বর করলে মাথা খারাপ হয়ে যায়-তা নয়। এ যে সুধার হ্রদ, অমৃতের সাগর। বেদে তাঁকে অমৃত বলেছে। এতে ডুবে গেলে মরে না, অমর হয়।" ১৮-১৯

"সব গোল মেটে, তিনিই আস্তিক, তিনিই নাস্তিক, তিনিই ভাল, তিনিই মন্দ, তিনিই সৎ, তিনিই অসৎ, জাগা, ঘুম এসব অবস্থা তাঁরই আবার তিনি এসব অবস্থার পার।" ১৯

"শ্রীরামকৃষ্ণ বঙ্কিমের প্রতি-কেউ কেউ ডুব দিতে চায় না। সচ্চিদানন্দ অমৃতের সাগর। আমি নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাস করেছিলাম, মনে কর যে একখুলি রস আছে, আর তুই মাছি হয়েছিস, তুই কোনখানে বসে খাবি? নরেন্দ্র বললে, আড়ায় (কিনারায়) বসে মুখ বাড়িয়ে খাব। আমি বললুম কেন? মাঝখানে ডুবে খেলে কি দোষ? নরেন্দ্র বললে তাহলে যে রসে জড়িয়ে মরে যাব। তখন আমি বললুম, ওরে সচ্চিদানন্দ রস তা নয়, এরস অমৃত রস, এতে ডুবলে মানুষ মরে না, অমর হয়। ২০—২১

"আমি সাকারবাদীদের কাছে সাকার, নিরাকারবাদীদের কাছে নিরাকার।" ২১

"যিনি সাকার, তিনিই নিরাকার, তিনি আরো কত কি?" ২২

"ইতি করিস্ না।" ২২

"তাঁর ইতি করো না।" ২৩

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ভক্তদের বলছেন :—

"যেমন একজন লোক পাঁচীলের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে, পাঁচীলের দু-দিকেই অনন্তমাঠ—সেই পাঁচীলের গায়ে যদি ফোকর থাকে পাঁচীলের ওধারে সব দেখা যায়। বড় ফোকর হলে আনাগোনাও হয়। অবতারবাদির আমি ঐ ফোকর-ওয়ালা পাঁচীল। পাঁচীলের এধারে থাকলেও অনন্ত মাঠ দেখা যায়।" ২৩—২৪

বিষয় পৃষ্ঠা

"মানুষে তিনি বেশী প্রকাশ। মাঠের আলের ভিতর ছোট ছোট গর্ত্ত থাকে তাদের বলে ঘুটী, ঘুটীর ভিতর মাছ কাঁকড়া জমে থাকে।" ২৪
"স্বামিজীকে ঠাকুর বললেন, যে রাম, যে কৃষ্ণ।সেই এবারে এই দেহে রামকৃষ্ণ-তবে তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।" ২৪—২৫
"ভগবানের প্রেম দুর্লভ।" ২৫
"হাততালি দিয়ে নাম কর।" ১৫—২৬
"ঈশ্বরের নামে মানুষ পবিত্র হয়। তাই নাম কীর্ত্তন অভ্যাস করতে হয়।" ২৬—২৭
"ঈশ্বরকে না জানলে ক্রমশঃ ভিতরের চুনোপুঁটি বেরিয়ে পড়ে।" ২৭—২৮
"ঈশ্বরের দরজায় অহংকারের গুঁড়ি পড়ে আছে ইত্যাদি-ভূতসিদ্ধ ভূতকে চুল সোজা করতে বলে ভূতের হাত থেকে রেহাই পায় ইত্যাদি।" ২৮—২৯
"ঈশ্বরের কৃপায় তীব্র বৈরাগ্য হলে এই কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি থেকে নিস্তার হতে পারে। তীব্র বৈরাগ্য কাকে বলে? হচ্ছে হবে, ঈশ্বরের নাম করা যাক্, এসব মন্দ বৈরাগ্য, যার তীব্র বৈরাগ্য তার প্রাণ ভগবানের জন্যে ব্যাকুল, মার প্রাণ যেমন পেটের ছেলের জন্য ব্যাকুল। যার তীব্র বৈরাগ্য সে ভগবান ভিন্ন আর কিছু চায় না।" ২৯
"তাঁর কৃপা হলে আর ভয় নাই।" ২৯—৩০
'ঈশ্বর দর্শন হয় এ কথা কাকেই বলি কে শুনে?" ৩০
"মানুষের ভিতর যখন ঈশ্বর দর্শন হবে তখন পূর্ণ জ্ঞান হবে" ৩০—৩১

বিষয় **পৃষ্ঠা**

"যদি ঈশ্বর সাক্ষাৎ দর্শন হয়, তাহলে ঠিক বলা যায়। যে দর্শন করেছে, সে ঠিক জানে ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার আরো কত কি মুখে বলা যায় না।" ৩১

"শ্রীবাস ষড়্ভুজদর্শন করছেন, আর স্তব করছেন,—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া ষড়ভুজ দর্শন করিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের ঈশ্বর আবেশ হইয়াছে। তিনি অদ্বৈত, শ্রীবাস হরিদাস ইত্যাদির সহিত ভাবে কথা কহিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের ভাব বুঝিতে পারিয়া নিতাই গান গাহিতেছেন ঃ—"

কই কৃষ্ণ এল কুঞ্জে প্রাণ সই!

শ্রীরামকৃষ্ণ গান শুনিতে শুনিতে সমাধিস্থ হলেন।" ৩২

"ঈশ্বর আনন্দ সর্ব্বোত্তমস্তর।" ৩২—৩৪

"মিছরির পানা খেলে চিটে গুড়ের পানা তুচ্ছ হয়ে যায়।" ৩৪

"১ সের চালে ১৪ গুণ খই হয়। দোকানী চালের রেকে যাতে ইন্দুর না খায় তাই মুড়কি করে রেখে দেয় মুড়কির সোঁদা গন্ধে ইন্দুর মুড়কি খেয়ে যায় চাল খেতে পারে না।" ৩৪—৩৫

"ঈশ্বর লাভ করলে তাঁর বাহিরের ঐশ্বর্য্য তাঁর জগতের ঐশ্বর্য্য ভুল হয়ে যায়।" ৩৫

"যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি বাড়ী যায়।
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।" ৩৫—৩৬

"শাস্ত্র গুরু মুখে শুনে নিতে হয়।" ৩৬—৩৭

"গুরুকৃপা হলে আর কোন ভয় নাই, একটু সাধন করলেই গুরু বুঝিয়ে দেন এইটাই।" ৩৭

"গুরুবাক্যে বিশ্বাস।" ৩৭—৩৮

"বিশ্বাসে কি না হয়"? ৩৮—৪০

বিষয় **পৃষ্ঠা**

“বিশ্বাসে মিলায় বস্তু।” ৪০
“চাই ব্যাকুলতা”। ৪১—৪২
“ব্যাকুলতা দ্বারা ঈশ্বর লাভ হয়’। ৪২—৪৩
“কিছুদিন নির্জ্জনে থাকতে হয়। বুড়ী ছুয়ে ফেললে আর ভয় নাই। সোনা হলে তারপর যেখানেই থাক। নির্জ্জনে থেকে যদি ভক্তিলাভ হয় যদি ভগবান লাভ হয়, তাহলে সংসারেও থাকা যায়।” ৪৩—৪৫
“সরল হলে সহজে ঈশ্বর লাভ হয়।” ৪৬
“তমোগুণে সংহার।” ৪৬—৪৭
“তমোগুণকে মোড় ফিরিয়ে দিলে ঈশ্বর লাভ হয়”। ৪৭—৪৮
“তিনের কৃপা হলো—একের কৃপা বিনা জীব ছারে-খারে গেল”। ৪৮—৪৯
“মন নিয়ে কথা। মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। মনকে যে রঙে ছোপাবে, সেই রঙে ছুপবে। যেমন ধোপা-ঘরের কাপড়”।’ ৪৯
“ঈশ্বরে মন রাখার উপায় সৎসঙ্গ, মাঝে মাঝে নির্জ্জনবাস ও সর্বদা ঈশ্বরের নামগুণ’। ৪৯
“মন মুখ এককরা”। ৫০
“ঘরের ভিতর যদি রত্ন দেখতে চাও আর নিতে চাও তা’হলে পরিশ্রম করে চাবি এনে দরজার তালা খুলতে হয়। তারপর রত্ন বার করে আনতে হয়”। ৫০
“মনে অভিমান করবে আর বলবে তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ, দেখা দিতে হবে”। ৫০
“সাধক অবস্থায় মনটা নেতি নেতি করে তাঁর দিকে দিতে হয়। সিদ্ধ অবস্থায় আলাদা কথা। তাঁকে লাভ করবার পর অনুলোম বিলোম”। ৫১

বিষয় পৃষ্ঠা

“মন থেকে সব ত্যাগ না হলে ঈশ্বর লাভ হয় না”। ৫১

“তিনি শুদ্ধ মনের গোচর”। ৫১—৫৬

“শুদ্ধ মনে যা উঠবে তা তাঁরই বাণী”। ৫৬—৫৭

“সাধন করে এগিয়ে পড়”। ৫৭—৬০

“আমরা যত কাশীর দিকে এগিয়ে যাবো ততই কলকাতা পেছনে পড়ে থাকবে”। ৬০

“যে যত ঈশ্বরের দিকে যাবে, তার তত বালকের মত স্বভাব হবে”। ৬০

“বাবলা গাছ দেখে ভক্তের ভাব হল, যে এতে রাধাকান্তের বাগানের কোদালের বাঁট হয়”। ৬০—৬১

“মন্দির দেখলে তাঁকেই মনে পড়ে, উদ্দীপন হয়। যেখানে তাঁর কথা হয়, সেইখানে তাঁর আবির্ভাব হয়”। ৬১

“(ভক্তদিগকে) আমি (শ্রীশ্রীঠাকুর) তাদের মা আনন্দময়ী দেখব। তারা চৈতন্যদেব সেজেছে, তা হলেই বা, শোলার আতা দেখলে সত্যকার আতার উদ্দীপন হয়”। ৬১—৬২

“টাকা মাটী, মাটী টাকা।” ৬২—৬৪

“ভাগবৎ, ভক্ত, ভগবান তিনে একে একে তিন।” ৬৪—৬৭

“যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা, যিনিই সাকার, তিনিই নিরাকার”। ৬৮—৬৯

“জড়ের সত্তা চৈতন্যে লয়, চৈতন্যের সত্তা জড়ে লয়।” ৬৯—৭১

“আত্মা যদি থাকেন তো অনাত্মাও আছেন”। ৭১—৭২

“বেলের সার বলতে গেলে শাঁসই বুঝায়। তখন বীচি আর খোলা ফেলে দিতে হয়। কিন্তু বেলটা কত ওজনে ছিল বলতে গেলে শুধু শাঁস ওজন করলে হবে না। ওজনের সময় শাঁস, বীচি খোলা সব নিতে হবে।” ৭২—৭৩

“যার অটল আছে তার টলও আছে”। ৭৩

বিষয় পৃষ্ঠা

"এখানে যারা আসবে তাদের শেষ জন্ম। আবার বলেছেন, এখানে যারা এসেছে তাদের এইটুকু জানলেই হবে যে প্রথম আমি কে? আর তারপর তারা কে"? ৭৪—৭৫

"কথামৃত মুখে চিঠির গল্প আছে। চিঠিটা হারিয়ে গিয়েছিল, শেষে অনেক খোঁজার পর চিঠিটা পাওয়া গেল। পড়ে দেখে—পাঁচসের সন্দেশ ও একখানি রেলপাড় কাপড় পাঠাবার কথা আছে।" ৭৫

"দেহ যেন সরা।' মনরূপ জল, তাতে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব পড়ে।" ৭৫—৭৬

"চৈতন্যবায়ু যেমনে নিয়ে যাবে।" ৭৬

"ওদেশে হালদার পুকুর দেখেছিলাম পানায় ঢাকা। যেখানেই পানা একটু সরে গেছে সেখানেই পরিষ্কার জল"। ৭৭

"আবার আছে, ব্রহ্ম অবাঙমনসোগোচর। জ্ঞানসূর্য্যের তাপে সাকার বরফ গলে যায়। ব্রহ্মজ্ঞানের পর, নির্ব্বিকল্প সমাধির পর, আবার সেই অনন্ত, বাক্যমনের অতীত, অরূপ, নিরাকার ব্রহ্ম।" ৭৭

"যখন জগৎ নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয়, তখন মা সৃষ্টির বীজ সকল কুড়িয়ে রাখেন। গিন্নীর কাছে যেমন একটা ন্যাতা কাতার হাঁড়ি থাকে, আর সেই হাঁড়িতে পাঁচরকম জিনিষ তুলে রাখে"। ৭৮

"ঋষিরা ও জ্ঞানীরা ভয় তরাসে। বিজ্ঞানী পাকা খেলোয়ারের মত"। ৭৮—৭৯

"ব্রহ্মজ্ঞানীরা ব্রহ্মমহিমা কীর্ত্তন করে কেন"? ৭৯

"জ্ঞান কাঁটা দিয়ে অজ্ঞান কাঁটা তোলা।" ৭৯

"এও কর্মযোগ"। ৭৯—৮০

বিষয় পৃষ্ঠা

“কর্ম করতে গেলে একটি বিশ্বাস চাই, সেই সঙ্গে জিনিষটি মনে করে আনন্দ হয়”। ৮০
“হাত ভাঙ্গা…অহঙ্কার নাশের জন্য…নির্মূল হবার জন্য”। ৮০
“খানদানী চাষা হাজার অনাবৃষ্টি হলেও চাষ-আবাদ ছাড়ে না।” রাগানুরাগা ভক্তি………বৈধী ভক্তি। ৮০—৮১
“গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব”। ৮১
“যত মত তত পথ”। ৮১—৮৩
“তোমরা সারে মাতে আছ, বেশ আছ—আমি বেশি কাটিয়ে জ্বলে গেছি।” ৮৩
“দাসত্ব করতে করতে, চাকরী করতে করতে দাসসুলভ মনোবৃত্তি গড়ে ওঠে।” ৮৩—৮৫
“ভক্ত সুরেন্দ্রের বাগানে মহোৎসব। শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—তখন লুচি খাই নাই। একটু লুচি এনে দাও…এর মানে আছে। খাই খাই মনে হ’লে আবার আসতে হবে”। ৮৫
“গঙ্গাস্নানের সময়, পূজা আহ্নিকের সময় যত রাজ্যের বাজে কথা বলে”। ৮৫
“গঙ্গাস্নানে সব পাপ যায়। গঙ্গায় নেমে যখন মানুষটা ফেরে, পুরানো পাপগুলো গাছ থেকে ঝাঁপ দিয়ে তার ঘাড়ের ওপর পড়ে”। ৮৬—৮৭
“শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টার মশাইয়ের প্রতি) স্বপ্নে কিছু দেখ? সধবা মেয়ে, শ্মশান, মশান, আগুনের শিখা? এসব দেখা খুব ভাল”। ৮৭—৮৯
“সাধু সাবধান”। ৮৯—৯০
“দুটি ‘ক’ থেকে সাবধান”। ৯০—৯১
“সন্ন্যাসী নারী হেরবে না”। ৯১—৯২
“কেল্লায় নেমে যাওয়ার মত।” ৯২—৯৩

বিষয় **পৃষ্ঠা**

"চিলশকুনি অনেক উঁচুতে ওঠে কিন্তু নজর ভাগাড়ে"। ৯৩

"স্বাধীন ইচ্ছা।" ৯৩—৯৪

"বুড়ির খেলা চলুক"। ৯৪—৯৫

"বোম্বাই আমের গাছে নেকো আম হয় না। বোম্বাই আম হয়, হয়তো একটু তফাৎ হয়ে যায়।" শ্রীশ্রীঠাকুর প্রশ্ন—কিন্তু বিদ্যাসাগরের ছেলে, চিত্তরঞ্জনের ছেলে, গান্ধীজীর ছেলে এরা সব একেবারে উল্টো প্রকৃতির কি করে হয়"? ৯৫

"কি জান? মানুষ সব দেখতে এক রকম কিন্তু কারু ভিতর ক্ষীরের পোর··· ।" ৯৬

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ—হাজরার সঙ্গে নরেন্দ্রনাথকে বেশী মেলা-মেশা করতে বারণ করছেন, বলছেন—এমন সব আছে, মুখে রাম নাম করে কিন্তু বগলে ইট।' ৯৬

"দয়া কিরে? কীটাণুকীট তুই, দয়া করবার তুই কে? সেবা-সেবা, শিবজ্ঞানে জীব সেবা।" এই কথা শুনেই স্বামিজী বলেছিলেন ঠাকুর আজ বনের বেদান্তকে ঘরে ঢোকালেন, কত বড় কথা বললেন বল তো"? ৯৭

"উন্মাদ অবস্থায় লোককে ঠিক ঠিক হক কথা বলতুম। কারুকে মানতাম না। বড়লোক দেখলে ভয় হতো না। সৌরীন্দ্রঠাকুরের বাড়ী গিছলাম। তাকে দেখে বললাম, তোমাকে রাজা টাজা বলতে পারব না। কেননা সেটামিথ্যা কথা হবে।' বরাহনগরের ঘাটে দেখলাম, জয় মুখুজ্যে জপ করছে, কিন্তু অন্যমনস্ক তখন কাছে গিয়ে চাপড় দিলাম। একদিন রাণী রাসমণি কালীঘরে এসে অন্যমনস্ক হয়ে ফুল বাচ্ছে অমনি তুই চাপড়"। ৯৮

"শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমকে বলছেন সাধ ছিল—বিয়ে করব, সাধ আহ্লাদ করব···ইত্যাদি।" ৯৮

বিষয় পৃষ্ঠা

ওদেশে যাচ্ছি বর্দ্ধমান থেকে নেমে, আমি গরুর গাড়ীতে বসে,—এমন সময় ঝড়বৃষ্টি। আবার গাড়ীর সঙ্গে কোত্থেকে লোক এসে জুটলো। আমার সঙ্গের লোকেরা বললে এরা ডাকাত। আমি তখন ঈশ্বরের নাম করতে লাগলাম। কিন্তু কখনও রাম রাম বলছি, কখনও কালী কালী কখনও হনুমান হনুমান সবরকমই বলছি এ কি রকম বল দেখি।" ৯৮—৯৯

"ঠাকুর—ডাঃ রুদ্রকে নিজের ভাবের কথা বলছিলেন, টাকা ছুলে শরীরের কুঞ্চন ও শ্বাস রোধ ইত্যাদি।" ৯৯

"সকলের ঘড়ি সূর্য্য ঘড়ির সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হয়"। ১০০

"মা আরও একটা দিন যে গেল-দেখা দিলি কই"? ১০১

গরীবদের জামা কাপড় না দিলে, তীর্থে যাবেন না বলে ঠাকুরের মাঝপথে বসে পড়া।" ১০১—১০২

"শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আসন গ্রহণ করা।" -শ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি- ১০২—১০৩

"সমীকরণ"। ১০৩

পরিশিষ্ট

১

"ভগবানের নামের বীজ কতটুকু? তা থেকেই কালে ভাবভক্তি প্রেম এসব কত কি হয়।" শ্রীশ্রীমা ১০৪—১০৫

"নির্বাসনা চাই"। শ্রীশ্রীমা ১০৫—১০৬

"মনের প্রথম কথা শুনতে হয়"। শ্রীশ্রীমা ১০৬—১০৮

"সব এক সময়ে সৃষ্টি হয়েছে। যা হয়েছে সব এককালে হয়েছে, একটি একটি করে হয়নি"। শ্রীশ্রীমা ১০৮—১১০

"যাতে লোকের উপকার হয় তা করতে হয়। তবে নিজের মন সায় দিলে করবে না হলে নয়"। শ্রীশ্রীমা ১১০—১১৫

বিষয় **পৃষ্ঠা**

"সন্ধিক্ষনে ধ্যান করবে"। শ্রীশ্রীমা ১১৫

"স্বামীজির কথা – ঠাকুরের এক একটা বাণী থেকে ঝুড়ি ঝুড়ি গ্রন্থ লেখা যায়"। ১১৫—১১৬

স্বামীজি—"ওগো তুমি আমায় একি করলে, আমার বাবা আছে, মা আছে।" ১১৬—১১৮

নরেন্দ্র—প্রমান না পেলে কেমন করে বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর মানুষ হয়ে আসেন"? ১৮

গিরীশ—বিশ্বাসই Sufficient Proof। এই জিনিষটা এখানে আছে এর প্রমাণ কি? বিশ্বাসই প্রমাণ। ১১৮—১১৯

"চাটের লোভে গুলি খাওয়া।" ১১৯—১২০

পরিশিষ্ট

২

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতবাণীর ভাবাবলম্বনে সঙ্গীত ১২১—১৩২

ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ।।

—স্বামী বিবেকানন্দ

ওঁ নিরঞ্জনং নিত্যমনন্তরূপং ভক্তানুকম্পাধৃতবিগ্রহং বৈ
ঈশাবতারং পরমেশমীড্যং ত্বং রামকৃষ্ণং শিরসা নমামঃ ।।

—স্বামী অভেদানন্দ

বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।
তোমার জীবনে অসীমের লীলা পথে
নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে।
দেশবিদেশের প্রণাম আনিল টানি,
সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি।

—রবীন্দ্রনাথ

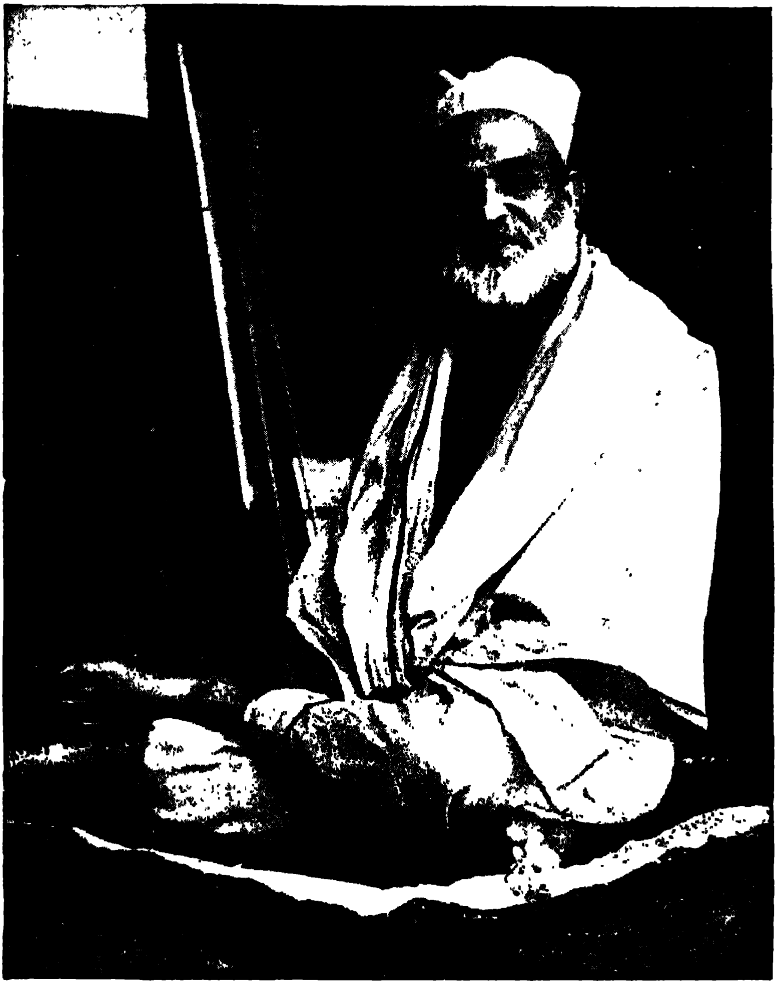

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত প্রসঙ্গে

"কথামৃতের কথা
সে যে সবার মুখের ব্যথা" ॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এ যুগের পঞ্চম বেদ। এত সহজ সরল ভাষায় সহজ উপমা দিয়ে বেদ বেদান্ত যোগ এ সবের কথা শ্রীশ্রীঠাকুর বুঝিয়েছেন যে ভাবলে অবাক হ'তে হয়। নিরক্ষর জ্ঞান—সিন্ধুর এক একটি কথায় লুকিয়ে আছে যতো জ্ঞানের গভীর তত্ত্ব, ততো সাহিত্যমাধুর্য্য, ততো সারল্য—আর বাংলার ছায়া ছায়া পল্লীর শ্যামস্নিগ্ধতা, যতো পড়ি ততো অবাক হই। গীতা, বেদ বেদান্ত এই জন্য এখন মানুষের মনে যতো ছাপ না দেয়, ততো বেশী গভীরভাবে ছাপ দেয় কথামৃত।

কথামৃত হচ্ছে এ যুগের মানবতার বাইবেল। মানবতার এই বাইবেলে রয়েছে ধর্মের কত না গুঢ় তত্ত্ব; যেমন সাংখ্য দর্শনের পুরুষের নিশ্চেষ্টতা আর প্রকৃতির প্রসবধর্মী স্বভাবের সঙ্গে বিবাহ উৎসবে নিশ্চেষ্ট গৃহকর্ত্তার আর চঞ্চল গৃহকর্ত্রীর তুলনা। মার্থা মেরীর অনুরাগের কথা, মহামহিম আল্লার কথা; ভগবান বুদ্ধের কথা, কি যে নাই।

আরো রয়েছে সমসাময়িক ভক্ত মহাপুরুষদের সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের আলাপ—সংলাপ। এঁদের মধ্যে রয়েছেন দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর, সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিম, কবি মাইকেল, ব্রহ্মানন্দ কেশব, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, আরো কত না জীবনাদর্শ ধরা এর পত্রে। ধার্মিক তাঁতীর রামের ইচ্ছায় জীবনায়ন, ফোঁস না করা সাপের চরিত্র, এমনি কত তত্ত্বমনিই যে ছড়ান রয়েছে কথামৃতের পাতায় পাতায়। কথামৃত যেন জগতের এক বিরাট চিত্রশালা। অদ্ভুত সব চিত্রের সমাবেশ হয়েছে এই কথামৃত মুখে।

আর আছে মিষ্ট কথায় নিজের লীলাঙ্কন নানা ভক্ত সঙ্গে, নানা পরিবেশে, রঙ্গিন তার পর্ণপুট আর তারই সঙ্গে সঙ্গে ছন্দিত হয়ে রয়েছে কত মধুর কণ্ঠের সাধন সঙ্গীত—সমস্ত মিলিয়ে কথামৃত যেন

এক সব পেয়েছির স্বর্গ....মর্ত্যের বুকে অমরার অবদান—নিত্য বৃন্দাবনে নিত্য ভগবানের সঙ্গ।

গীতা, কথামৃত এগুলো ভগবানের direct বাণী, বিশেষ কথামৃত। কালে ওই এক একটী বাণী নিয়ে ঝুড়ি ঝুড়ি দর্শন লেখা যাবে বা সম্ভব হবে। ভবিষ্যতে কত উপকারে লাগবে ওই বাণী। তাছাড়া কথামৃত শুনতে শুনতে বা পড়তে পড়তে যদি সেগুলো ধ্যান করা যায় —'সচ্চিদানন্দ সাগরে সাঁতার কাটছি' ইত্যাদি মনেহয় ভালই লাগবে। তারপর মায়ের বাণী—"ভয়কি? তোমাদের জন্যে আমি আছি।" এটি ওই মৃত্যুমুখে মনে পড়বে আর মনের অনেক জ্বালা যন্ত্রণা নষ্ট হয়ে যাবে, মনে শান্তি পাবে। সাহস আসবে, ভরসা আসবে, মৃত্যু ভয় কাটিয়ে যাত্রার পথ শান্তিপূর্ণ হয়ে উঠবে। যখন অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে, যাত্রা করতে হবে, তখন পরপারের পথে আর কেউ থাকবে না। তখন ওই ঠাকুরের নাম, ধ্যান, পূজা পাঠের ফলই যাবে সঙ্গে। এগুলো ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য direct কর্ম। আর এ ছাড়াও আরও অনেক কর্ম মানুষকে করতেই হয় যেগুলো না করলেও চলে না। কিন্তু সেগুলিও ঠাকুরের নাম স্মরণ করে করতে পারলে ভাল হয়। সেগুলো Indirect কর্ম। কথামৃতের বাণী, গীতার বাণী, শ্রীমার বাণী ঐগুলো সব পড়তে হবে আর মনে মনে আওড়াতে হবে। সেই অনুসারে কিছুটাও চলার চেষ্টা করতে হবে, সেই লীলাচিত্র ধ্যান করলে ক্রমশঃ জগৎ থেকে মনকে switch-off করা কত সহজ হবে, কিন্তু ওই গতানুগতিক পড়লাম আর ভুলে গেলাম, তা করলে চলবে না। বাণীগুলো মনে গেঁথে নিতে হবে।

কথামৃত বুঝতে না পারলেও, ভাল লাগুক বা নাই লাগুক, রোজ পাঠ করতে হবে। আমি নিজে নিয়ম করে নিয়েছি—সেজন্য পাঠ করে যাই তিনবার। তাছাড়াও আমার পায়খানা যাওয়ার সময়, স্নানের সময় ও খাওয়ার সময় বাইরে থেকে আমাকে পাঠ শুনায়। ভাগবৎগ্রন্থ নিয়ে পড়ে থাকতে পারলে তাতে ভাব-সত্ত্বা প্রকাশিত হয়।

"ঈশ্বর আছেন, তাঁর সৃষ্টি দেখলে বোঝা যায়"।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব উড়িয়ে দেওয়া সহজ কথা নয়; যুগে যুগে অবিশ্বাসীর দল মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে বটে—ভগবৎ অস্তিত্বকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করেছে সত্যিই, কিন্তু কোথায় আজ তারা? অথচ ভগবানে বিশ্বাস চির অবিনশ্বর। এই বিশ্বাস বলতে আমি বোঝাচ্ছি সমষ্টি মনের বিশ্বাস। ব্যষ্টি-মনের সাময়িক বিশ্বাস চলে গেলেও, সারা বিশ্ব জুড়ে সমষ্টি মনে যে ভগবৎ-বিশ্বাস, সেই সৃষ্টির আদি উষা থেকে সে কি বৃথা? 'ঈশ্বর আছেন, তাঁর সৃষ্টি দেখলে বোঝা যায়' ঠাকুরের এই মহাবাণীর কত যে দ্যোতনা, কত যে অর্থ, সে আমরা যত পড়ি তত বুঝতে পারি। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরই এক জায়গায় বলেছেন—যে বাবুর ঐশ্বর্য্য নাই, সে বাবু 'বাবু' কিসের? তেমনি এই জগৎ সেই ঈশ্বররূপ বিরাট স্রষ্টার ঐশ্বর্য্য। একজন দার্শনিক যেমন বলেছেন, গভীর জঙ্গলের মধ্যে চলতে চলতে যদি সুন্দর একছড়া মালা দেখতে পাই তাহলেই মনে হবে, কে এ মালা গাঁথলো? নিশ্চয়ই এর স্রষ্টা আছে। তখন নিশ্চয়ই মনে হবেনা এ মালা প্রকৃতির কোন কারণে accidentally গাঁথা হয়ে গেছে; তেমনি চন্দ্র-সূর্য্য শোভিত এই সুন্দর জগৎ, যার মধ্যে দিন, রাত্রি, ঋতুপরিবর্তন সমস্ত কিছুই শৃঙ্খলাযুক্ত ভাবে হচ্ছে, প্রচণ্ড গ্রীষ্মের পর হঠাৎ যেমন প্রচণ্ড শীত আসে না, আবার সারা বিশ্বে একটা সুসামঞ্জস্যের মধ্যে একটা বৈচিত্র্যও দেখা যায় বিশাল জলধি, উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশৃঙ্গ, শস্যশ্যামল ক্ষেত্র, আবার ধূ-ধূ বালিয়াড়ি মরু প্রান্তর, বিচিত্র মানুষ, বিচিত্র দেশ সবই সেই স্রষ্টার মহিমা প্রকাশ করছে।

এ ছাড়া সমস্ত বিশ্বেই দেখা যাচ্ছে প্রত্যেক কার্য্যেরই এক একটি

সুনির্দিষ্ট কারণ রয়েছে, একই কারণ একটী নির্দিষ্ট কার্য্যই ঘটিয়ে থাকে, তেমনি এই বিরাট সৃষ্টিরূপ কার্যের কারণ সেই ঈশ্বরই নিজে। আমরা যদি একটী বীজ পুঁতি তাহলে একটী অঙ্কুরিত চারাগাছই পেয়ে থাকি, সেটী হঠাৎ একটী মানুষ বা পাখী হয়ে যায় না, কেননা বিশ্বের প্রতিটি কার্য্যের পেছনে বা প্রতিটী প্রকাশের পেছনে একটি চৈতন্যশক্তি খেলা করছে। কাজেই জগৎরূপ কার্য্যের পেছনে সেই বিরাট চৈতন্যশক্তিই খেলা করছে, এ তো জগৎ দেখে প্রতিনিয়তই বুঝতে পারছি।

তারপর এই বিশ্বের সমস্ত ব্যষ্টি-মনের পেছনে কাজ করে যাচ্ছে একটী বিরাট সমষ্টি-মন; তিনিই ঈশ্বর। ভাববাদীরা বলেন, আগে ভাব তারপর বস্তু; তেমনি এই জগৎরূপ সৃষ্টির আগে সেই বিরাট চৈতন্যময় মনেও জেগেছিল সৃজনের ইচ্ছারূপ ভাব, তারপর জগৎ-রূপ স্থূলবস্তুর প্রকাশ সম্ভব হল।

আমরা আমাদের প্রত্যেকটি কাজের আগে মনে মনে একটী পরিকল্পনা করি তবে কাজ করি। আমাদের কাজের পেছনে যেমন আমাদের চেতন-মনের প্রকাশ রয়েছে, তেমনি সৃষ্টিরূপ বিরাট কাজের পেছনে রয়েছে ঈশ্বরের সেই বিরাট চৈতন্যময় মনের পরিকল্পনা।

বিরাট চৈতন্যময় মনের পরিকল্পনা ভিন্ন এই জগৎ-সৃষ্টি সম্ভব নয়। ওদেশের বড় বড় দার্শনিকেরাও এ-কথা মেনেছেন।

অবশ্য ডারউইন প্রমুখ Evolutionistরা ঈশ্বর মানেন না। তাঁরা এই সৃষ্টিতে ছোট্ট প্রাণপঙ্ক বা প্রোটোজোয়া থেকে ক্রমবিবর্তনের ধারায় ক্রমে বাঁদর পর্যন্ত ব্যাখ্যা করেছেন, আরও বলেছেন বাঁদর থেকে মানুষের উদ্ভব। কিন্তু যতই তাঁরা ব্যাখ্যা করে চলুন, এখানেই তাঁরা মেলাতে পারেননি; বাঁদর বা বাঁদরেতর কোন প্রাণীর মধ্যেই morality নাই এখানেই তাঁদের মতবাদে থেকে গেছে একটা বিরাট missing link. কেউ কেউ বলেন, একদল বাঁদরের উপর Cosmic ray পড়ে হঠাৎ মানুষের সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু Cosmic ray তো সর্ব্বদাই বর্ষিত হচ্ছে, তবে কেন অন্য সমস্ত বাঁদর মানুষ হচ্ছে না?

কাজেই ওঁদের ব্যাখ্যা এইখানেই পরাজয় মানছে। ওই যে missing link থেকে গেছে, আমরা বলব ওটা ভগবানের special grace. ভগবানের বিশেষ শক্তিতেই মানুষের উদ্ভব, morality-যুক্ত, চৈতন্যযুক্ত, বোধিযুক্ত মানুষের উদ্ভব। যাই হোক, তাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই মানুন, কিন্তু তাঁদের survival of fittest মতবাদেই সর্ব্বত্র বোধির জয়গান ঘোষিত হয়েছে। প্রকৃতির নির্ব্বাচনে সর্বত্র বুদ্ধিই জয়যুক্ত একথা তাঁরাও মানতে বাধ্য হয়েছেন। তাই যদি হয়, তবে এই চৈতন্যময় বুদ্ধির জয়ের ব্যবস্থা একজন চৈতন্যস্বরূপ বুদ্ধিমান শক্তিছাড়া আর কে করেছে? কিন্তু মতবাদের শেষ নাই, শুধুমাত্র তর্কের দ্বারা সবটুকু বোঝা যায় না—'নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া'! আধুনিক মতে অনেকে বলেন এই জগতের আবির্ভাব আপনিই বা accidentally হয়েছে। এর কোন সৃষ্টি-কর্ত্তা নাই। কিন্তু এই প্রশ্নেরও উত্তর দেওয়া যায় এই জগৎ যে রয়েছে, সেটী বুঝছে কে? আমরাই বুঝছি আমাদের ব্যষ্টি ও সমষ্টি মানব-চেতনা দিয়ে। একজন মৃতের কাছে জগতের কোন মূল্য নাই, জগৎসত্তার কোন অস্তিত্বই নাই। কাজেই এই সমগ্র সৃষ্টি যাঁর কাছে প্রকাশিত হচ্ছে, তিনি যে এক সমষ্টি চৈতন্যময় বিরাট সত্তা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাঁর চৈতন্যে চৈতন্যময় আমরা ব্যষ্টি বা সমষ্টি মানব এই জগৎকে বোধ করছি, জানছি।

তারপর আমরা দেখি, জগতে অধিকাংশ মানুষের মধ্যে সৎ-অসৎ বোধ আছে। সৎ কাজের ফল শুভ, অসৎ কাজের ফল অশুভ, এই বোধ বা পরিণাম চিন্তা কোথা হতে মানুষের মনে এলো—যদি না জগতের পেছনে সৎ-অসৎ কর্মের ফলদাতা একজন বিচারক না আছেন। এই সৎ-অসতের ফলদাতাই ঈশ্বর। জগতে সবাই একই রকমের নয়। কেউ ধনী, কেউ নির্ধন, কেউ সুস্থ, কেউ অসুস্থ, এই যে বৈষম্য, এইখানেই এসে যায় জন্মান্তরবাদ, কর্মফলবাদ। দেখা যায়, মানুষ প্রচণ্ড চেষ্টা করেও একজন ঠিক আর এক জনের মত ধনী বা বুদ্ধিমান বা সুখী বা সুস্থ হতে পারে না। এ তো জগতে আমরা নিত্য নিত্য

দেখছি। শ্রীঠাকুরের ঐ যে কথা 'ঈশ্বর আছেন তাঁর জগৎ দেখলেই বোঝা যায়'—এ খুব দর্শনসম্মত, বিজ্ঞানসম্মত কথা। কাজেই শ্রীঠাকুরের বাণী moral argument দিয়েও ব্যাখ্যা করা যায়।

তারপর কাণ্টপ্রমুখ moral kingdomএর কথা বলেছেন। অনেক সময় দেখা যায়, ভালোমানুষ হয়তো এ জগতে কষ্ট পাচ্ছে। কিন্তু কাণ্ট বলেন পরকালে তারা নিশ্চয় সুখভোগ করে। তা যদি না হত তাহলে মানুষ আদর্শের জন্য, সত্যের জন্য প্রাণ দিত না। মিথ্যা, অন্যায়, স্বার্থবোধে জগৎটা অরাজকতায় ভরে উঠত। এই জগতের পারে আছে যে রাজ্য সে রাজ্যই হচ্ছে kingdom of heaven, সেইখানেই সৎ মানুষেরা পুরস্কৃত হয়।

মার্টিন্যু প্রমুখ দার্শনিকগণও বলেন আমাদের মধ্যে এই যে নৈতিক বোধ, এটার প্রসংসা যদি করতে হয়, তাহলে এর পরিপূর্ণ বিকাশ একটা জায়গায় নিশ্চয় আছে এটাও মানতে হবে। তা না হলে মানুষ কিসের আশায় নীতির পথ ধরে চলে, যদি তার বিশ্বাস না থাকে যে, সে চলেছে সত্যের পথ ধরে, এবং এটাই সত্য শিব-সুন্দরের পথ। কাজেই এই নীতিবাদের পরিপূর্ণ বিকাশ যেখানে তিনিই ভগবান; জগতের সব কিছুরই Standard. যেমন জগতের বিভিন্ন সময়ের মাপকাঠি হচ্ছে গ্রীনউইচের সময় Greenwich Mean Time.

মানুষের মনে এই যে ঈশ্বর-বিশ্বাস, এ চিরন্তনী—সেই কোন্ সুদূর অতীতকাল হতে চলে আসছে এই ঈশ্বর-বিশ্বাস। কিন্তু এই বিশ্বাসের পেছনে যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব না থাকত, তাহলে মানুষের মনে ঈশ্বরের ধারণা জাগল কি করে? তাই বলা যায়, ঈশ্বরের অস্তিত্ব যদি না আছে তাহলে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আজও পর্যন্ত সেই অদেখা বস্তুটাকে নিয়ে চিরন্তন একটা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব চলছে কেন? এই ভগবৎ অস্তিত্বে বিশ্বাস এটা শুধু সভ্যজাতির মধ্যেই নাই, অসভ্য বুনো জাতির মধ্যেও বিশেষভাবে আমরা দেখতে পাই। হটেনটট, বুশমেন, সাঁওতাল, কোল, ভীল প্রভৃতি সব

দেশের অসভ্য জাতির মধ্যেও কেন আমরা ভগবৎ বিশ্বাস দেখতে পাই ? কই 'হ-য-ব-র-ল'-কে নিয়ে যুগ যুগ ধরে মানুষ তো মাথা ঘামায় না। আমার মনে হয় ভগবৎ বিশ্বাস মানুষের জন্মগত instinct. এটী সাময়িকভাবে মানুষ ভুলে গেলেও দুঃখে, শোকে, রোগে, বিপদে আপদে বুকভরে ভগবানকে না ডেকে মানুষ পারে না।

আরও প্রমাণ হচ্ছে জগতের প্রত্যেকটী কীটপতঙ্গ থেকে মানুষ পর্যন্ত সকলেরই মধ্যে দেখা যায় কেউই নিজের পরিস্থিতিতে খুসী নয়, সকলেই চায় আরও উন্নতি, আরও সুখ। এখন এই যে upthrust গতি-ভঙ্গী, ঊর্দ্ধগতির প্রচেষ্টা বা আকুলতা, এর থেকেই তো মনে হয়, ঊর্দ্ধলোকে একটী সত্বা আছেন, যাঁর আকর্ষণে চন্দ্রের আকর্ষণে সাগরবুকে জোয়ার জাগার মত সকলের মনে জাগছে ঊর্দ্ধগমনের অভীপ্সা। অণু পরমাণুও ছুটে চলেছে ঊর্দ্ধগতিতে। সকলের মনে ঊর্দ্ধগতি প্রচেষ্টা বা প্রেরণা জাগাচ্ছেন কে ? তিনি ছাড়া ? আমাদের শান্ত সসীম মনে অনন্ত অসীমের ধারণা এলো কি করে ? যদি অসীম অনন্ত স্বরূপ ঈশ্বর না থাকবেন ?

তবে ভগবৎ বস্তু হচ্ছে metaphysical রাজ্যের কথা, physical রাজ্যের বস্তু বা তত্ব দিয়ে তাঁকে প্রমাণ করা যায় না। এটী অনুভূতির বিষয়। মস্তবড় দার্শনিক রাসেলও বলেছেন দর্শনশাস্ত্র, ভগবৎ-তত্ব, ধর্ম্মতত্ব প্রমাণ করতেও পারে না, আবার নস্যাৎ করতেও পারে না বা অস্বীকারও করতে পারে না। শ্রীরামানুজও বলেছেন ঈশ্বর আছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁকে প্রমাণ করা আমাদের সাধ্য নাই। বেদই তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ, এটী মেনে নিতে হবে।

ভগবৎ তত্ব তো metaphysical রাজ্যের কথা। প্রত্যক্ষ প্রমাণ সে বিষয় অসম্ভব হতেই পারে; কিন্তু এই physical রাজ্যের কথা উচ্চ উচ্চ বৈজ্ঞানিক তত্ব যেগুলি, সেগুলি বোঝেই বা কয়জন, আর সেগুলিও তো সব প্রত্যক্ষ প্রমাণের পর্য্যায়ে পড়ে না; তাই বলে সেগুলি মিথ্যা একথা বললে লোকে পাগল বলবে। যেমন বৈজ্ঞানিক বলে একটি ছুঁচের ডগায় লক্ষ লক্ষ ইলেকট্রন প্রোটন খেলা করে; কিন্তু সেই

ইলেকট্রন প্রোটনের খেলা খালি চোখে তো দূরের কথা, মাইক্রোস্কোপ বা খুব শক্তিশালী দূরবীন নিয়েও দেখা যায় না। কিন্তু সাধারণ লোকে বিজ্ঞানীর কথা মেনে নেয়। আবার যদি না মানে, তাহলে তাকে জীবন ভরা পরিশ্রম করে, বিজ্ঞান অধ্যয়ন করে, গবেষণাগারে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে, তবে যেমন কোন মতবাদকে সত্য বা মিথ্যা বলা যায় তেমনি যে ভাগবৎ-সত্তাকে জানবার জন্য মুনি-ঋষিরা যুগ যুগ ধরে ধ্যান করেছেন, যোগী গিরি-গুহা-বাসী হয়ে সাধনা করেছেন, তাঁদের উপলব্ধিজাত সত্যবস্তু বা ভগবৎ-বস্তুকেও উড়িয়ে দিতে যাওয়া তো ভ্রান্তি। আগে দীর্ঘদিন ধ্যান কর, সাধনা কর, তবে তো বলবে ভগবান আছে কি নাই।

মস্তবড় বৈজ্ঞানিক sir James Jeans দীর্ঘ বিজ্ঞান সাধনার পর ভগবান মানতে বাধ্য হয়েছেন: তিনি বলেছেন—জগতের পেছনে একটি পরিকল্পনাশীল ও নিয়ামকশক্তি আছে বলে মনে হয়। সেই পরিকল্পনাশীল ব্যক্তির সঙ্গে আমদের ব্যাষ্টি-মনের কিছু সাদৃশ্য আছে।

আসল কথা, যার জল-তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে, সেকি তখন জল নিয়ে বিচার করতে পারে? জল ভিন্ন সে তখন বাঁচতে পারে না। এখানেও ঠিক তাই আমাদের তাঁকে জানবার তৃষ্ণা জাগেনি, তাই আমরা তাঁকে নানা গোলমালের মাঝে হারিয়ে ফেলি। যখন সংসার দাবদাহে ঘুরেঘুরে আমাদের মনে তৃষ্ণা জাগবে সেই অমৃতের তখনই ঠিক তাঁরই সন্ধানে আমাদের ঘুরে বেড়াতে হবে; আর একদিন না একদিন এই তৃষ্ণা জাগবে সকলেরই। তিনি একদিন কৃপা করে আপনাকে ধরা দেবেন কারণ কৃপাই হচ্ছে শেষ কথা। গ্রীক দার্শনিক প্লটিনাস এর কথায় বলতে হয় আমরা চেষ্টা-বলে মন্দিরের দরজা পর্যন্ত যেতে পারি, কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করতে পারিনা। অর্থাৎ মন্দিরে প্রবেশাধিকার পাওয়া নির্ভর করছে তাঁর কৃপার ওপর। তাই আমাদের কাজ হবে তাঁর দুয়ারে আঘাত করা' সাধনা করা; তাহলে তাঁর কৃপা হবে, দ্বার খুলবেন। কৃপা হবেই হবে। ভগবৎ অস্তিত্ব জানা বা লাভ সবই কৃপার ওপর নির্ভব করছে,

উপনিষদ, গীতা, কথামৃত এসব শাস্ত্রেই ওই কৃপার কথা বলা হয়েছে। আমাদেরও তাই যুক্তকরে কৃপা প্রার্থনা জানাতে হবে তাঁর চরণে।

> **"ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। ভগবান**
> **এই জগৎব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে এরই মধ্যে রয়েছেন।**
> **তিনি জগতের আধার আধেয় দুই-ই। বেদে**
> **আছে ঊর্ণনাভের কথা, মাকড়সা আর তার জাল।**
> **মাকড়সা তার নিজের থেকে জাল বার করে,**
> **আবার সেই জালেই থাকে।"**

শ্রীশ্রীঠাকুর সৃষ্টিতত্ত্ব কতো সহজ কথায় সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলেছেন। সমগ্র সৃষ্টিতে আবার সৃষ্টির ঊর্দ্ধে তিনি ছাড়া কিছুই নাই, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। এই তত্ত্ব কতো সহজকথায় বুঝিয়ে বলেছেন। মানুষ যদি কোনো কিছু তৈরী করতে যায় তো তাকে বাইরে থেকে অনেক উপকরণ জোগাড় করতে হয় কিন্তু ঈশ্বরের ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন হয় না। তিনি স্বয়ং সঙ্কল্প মাত্র সব সৃষ্টি করেছেন। মমগ্র সৃষ্টির তিনি ছাড়া কোন অস্তিত্ব নাই। সৃষ্টির দ্বিতীয় কোন সত্তাও নাই কেননা সবইতো তিনি। মাকড়সায় উপমা দিয়ে বুঝিয়ে বলেছেন সৃষ্টির আধার আধেয় সবই তিনি।

"ঈশ্বরই বস্তু।"

ঈশ্বরই বস্তু..................শ্রীশ্রীঠাকুর।
বস্তুই দেশ-কালের বক্রতার কারণ........।
ঈশ্বরই দেশ-কালের বক্রতার কারণ ....।

Einstein এর মতে time-space-continuumএর curvature এর কারণ হচ্ছে matter. এখানে আমরা দেখছি যে, আদি বক্রতার কারণ হচ্ছেন ঈশ্বর। এতে materialism বা জড়বাদের সঙ্গে Idealism বা ভাববাদের দ্বন্দ্ব নিরস্ত হয়—মনে রাখতে হবে দেশ-কালই নির্গুণ সত্তা (Jeans: New Back ground of Universe P. 146). এই দেশকালে ঈশ্বর নাই। ঈশ্বর প্রকাশ হলেই দেশকালে সৃষ্টি সম্ভব হয়। বস্তুযুক্ত দেশকাল হচ্ছে

বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে Expanding Universe. আর সগুণ ব্রহ্মই বৃংহিত হন। দেশকালকে বেদে ও উপনিষদে ব্রহ্ম বলেছেন (অথর্ব্ব বেদ ১৯/৩৫, ছান্দ-৮/১৮/) । এতে বৈজ্ঞানিক সাধনার সঙ্গে আমাদের ঋষিদের উপলব্ধির কিছু ঐক্য দেখান হ'ল। আবার নির্গুণ ব্রহ্মই সগুণ হন। আবার ঈশ্বরই বস্তু'—কাজেই দেশ কালই ঈশ্বর। এদিকে বৈজ্ঞানিকের মতে দেশকাল Mental construct of a superior consciousness. বিরাট এক চেতন সত্তার মনের কল্পনা (Jeans : Physics and Philosophy. P. 172)। কাজেই জড় ও চেতনের পার্থক্য সরে যায়।

“ঈশ্বর শিশু স্বভাব।” (শ্রীশ্রীঠাকুর)।

ঈশ্বর শিশু স্বভাব······
তাই উচ্চ মহাপুরুষরা শিশু-স্বভাব হ'য়ে যান....
সেই অবস্থায় ভক্ত ভগবানের লীলাও Irrelevant হ'য়ে যায়···
Supra Irrelevancy সাধনের প্রয়োজন আছে···
Relevant ধ্যানাদির পরিপাকে···

দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর বলেছেন, ঈশ্বর শিশু স্বভাব। ও দেশের মনীষিরাও ঈশ্বরের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন Highest irrationality (হোয়াইট হেড)। অবশ্য জিন্‌স্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক দার্শনিকেরা ঈশ্বরকে গণিতজ্ঞ ব'লতে চেয়েছেন। তবে আমাদের ভাষায় তাঁকে যাই বলি সেটা আমাদের মতবাদ ছাড়া আর কিছু নয়। তবে শিশুদের খেয়াল যেমন কিছুই জানা যায় না তেমনি ঠাকুরের সম্বন্ধেও আমরা কিছু ব'লতে পারি না। তাই আমাদের বল'তে হয় তিনি কার্য-কারণ-বাদের বহু উর্দ্ধে। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের শেষ কথা যে রিলেটিভিটি তাতেও কার্য্য-কারণ-বাদ এক রকম পরিত্যক্ত হ'য়েছে। অনির্দিষ্টবাদ, Probability, Average এ সব এসে পড়েছে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে ঈশ্বর সম্বন্ধে যদি কিছু বলা যায়, তাহলে তাঁকে শিশুর মত লীলা চঞ্চল বলাই কতকটা ঠিক কথা। অবশ্য

আমরা যতক্ষণ কার্য্য-কারণ-বাদের ভিতর আছি, ততক্ষণ আমাদের সেই মত চ'লতে হবে। এবং আমাদের ঈশ্বরও কার্য-কারণ-বাদী। আমরা যখন কার্য-কারণের উর্দ্ধে উঠব তখন তিনিও তাঁর উর্দ্ধে। দেখা যায় যাঁরা ঈশ্বর লাভ ক'রেছেন তাঁরা শিশু স্বভাব হ'য়ে যান। মনের সব বন্ধন পড়ে যাওয়াতে তাঁরা শিশু ভোলানাথের মত হ'য়ে যান। আর আমরা যখন এমনি শিশু ভোলানাথের মত হ'তে পারব তখন সুখ দুঃখ ভালমন্দ সব দ্বন্দ্বের পারে চ'লে যাব। যাই হোক আমরা যখন ভগবৎ লাভ করে শিশুর মত হ'য়ে যাই আর ভগবান যখন বিরাট শিশু, এই দুইয়ের লীলা তখন এক বিরাট অনিয়মের ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়ায়। ঠাকুরও বিরাট খেয়াল খুশীর ঠাকুর, ভক্তও খেয়াল খুশীর শিশু তখন চলে এক বিরাট খেয়াল খুশীর খেলা। কাজেই আমাদের মধ্যে যাঁরা ভক্ত ভগবানের লীলার রাজ্যে প্রবেশের যোগ্যতা লাভ ক'রেছেন তাঁদের এমনি খেয়ালের সাধনা ক'রতে হবে। অবশ্য উচ্চতা লাভ করার আগে এ সাধনা করা বিপজ্জনক। খেয়ালের সাধনা যেমন দক্ষিণেশ্বরের লীলায় দেখা গেছে, হঠাৎ দুপুর রাত্রিতে উঠে ঠাকুর ব'ললেন খিদে পেয়েছে অথচ তার কিছু আগেই ঠাকুর হয়তো খেয়ে শুয়েছেন। এমন ঘটনা হয়েছে বহুবার। এগুলি 'Supra Irrelevancy. 'মায়ের সঙ্গে ঠাকুরের শিশু লীলা বহু হ'য়েছে। ঠাকুর যেমন বলেছেন, ওদেশে যাচ্ছি বর্দ্ধমান থেকে নেমে। আমি গরুর গাড়ীতে বসে, এমন সময় ঝড় বৃষ্টি। আবার গাড়ীর সামনে কোত্থেকে লোক এসে জুটলো। আমার সঙ্গের লোকেরা বললে এরা ডাকাত! আমি তখন ঈশ্বরের নাম ক'রতে লাগলাম। কিন্তু কখনও রাম রাম বলছি কখনও কালী কালী, কখনও হনুমান হনুমান, সব রকমই ব'লছি এ কি রকম বল দেখি!

"ঈশ্বর কল্পতরু—প্রার্থনা কর—তিনিই মনোবাঞ্ছা পূরণ করবেন।"

Philosophy তে coherenee of truth বলে একটা কথা আছে। সত্য যা তার সঙ্গে অপর সত্যের বিরোধ নাই তাই আমরা

দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের কথার সঙ্গে, দেশে দেশে, যুগে যুগে, যে শাস্ত্র গড়ে উঠেছে, সত্যদ্রষ্টারা যে শিক্ষা দিয়ে গেছেন, তার সঙ্গে অনেকটাই সঙ্গতি দেখতে পাই। এই প্রার্থনার কথা বাইবেলে ভগবান ঈশামশি বলেছেন!

'Seek ye first the kingdom of heaven and all other things will be added unto you.'

জাপানের Shinto ধর্মেও প্রার্থনার কথা পাই—If you pray the deity with sincerity you will assuredly realise the divine presence ; তুমি ঈশ্বরের কাছে অন্তর নিঙড়ে প্রার্থনা কর, ঈশ্বরের অস্তিত্ব তুমি নিশ্চিত অনুভব করবে। প্রার্থনার ওপর আরও জোর দেওয়া হয়েছে—A single prayer moves heaven. একটি মাত্র প্রার্থনায় স্বর্গেও নাড়া দেওয়া যায়। কিন্তু এই প্রার্থনা হওয়া চাই অন্তর নিঙড়ানো আকুল প্রার্থনা।

হিব্রুদেরও প্রার্থনায় বিশ্বাস ছিল। তারা বলত—Prayer is the worship of the heart. The prayer raises the soul up and blessings come down. প্রার্থনা হচ্ছে অন্তরের পূজা। প্রার্থনা ওঠে ঊর্দ্ধে, আশিস আসে নেমে। শূন্যবাদী বৌদ্ধদের মধ্যেও প্রার্থনার স্থান ছিল বা আছে। ইসলাম ধর্ম্মেও প্রার্থনার আছে স্থান। ঋষিদের প্রার্থনা—

অসতো মা সদ্‌গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, তুমি আমাদের অসৎ মোহশৃঙ্খল মুক্ত করে সৎ এর রাজ্যে নিয়ে চল। আঁধার-গহীনভীতি-বিহ্বল রাজ্য থেকে চিৎ জ্যোতিঘন রাজ্যে নিয়ে চল! মৃত্যুর কালিমা মুছে অমৃতময় লোকে নিয়ে চল।

শরণাগতদীনার্ত্তপরিত্রাণপরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে।

হে নারায়ণি, হে জননি ! আমি তোমার শরণাগত। আমায় রক্ষা কর !—চণ্ডীমুখে এই প্রার্থনা।

'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহিনিত্যম্'। হে প্রভু, তোমার রুদ্ররূপ আছে। কিন্তু আমাকে তোমার দক্ষিণামুখ দেখাও অর্থাৎ আমার প্রতি সদা প্রসন্ন হও, করুণা কর। বাইবেলে ভগবান আরও বলেছেন—

'Oh ! Lord, do not lead us unto temptations'. হে প্রভু, তুমি আমাদের গোলমালে ফেলে দিও না।

আর আমার মনে হয় ভগবানের চরণে ভক্তের প্রার্থনা—ইহও পরকালের অমৃত সেতু। ভক্ত-ভগবানের মিলনসেতু। প্রার্থনা মানেই সেই বিরাট শক্তির কাছে মাথা নীচু করা, শরণাগত হওয়া। পুরুষকারের দ্বারা মানুষ কতটুকু পারে, তাই প্রার্থনার প্রয়োজন আছে। তোমরাও সকলে ধ্যান, ধারণা, ত্যাগ, তপস্যা ছাড়াও প্রার্থনা খুব sincerely করবে। আমি তো দিনেদিনান্তে মুহূর্ত্তে প্রার্থনা করি—রক্ষ মাম্ পাহিমাম্। মা, হাড়শুদ্ধ পবিত্রতা নিয়ে আমি যেন যাত্রা করতে পারি। মা, আমার সাধুত্ব বজায় রাখো !

'ভগবান কল্পতরু, তাঁর কাছে চাইতে হয় "।

কল্পতরু এই কথাটা বেদে নাই—অবশ্য আছে যে তিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কচ্ছেন। কিন্তু কল্পতরুর মধ্যে যে দ্যোতনা আছে তেমন মধুর কথা নাই। অবশ্য "কৃষ্ণ ইব" বলে উল্লেখ আছে তবে কল্পতরু এ-কথা নাই। শঙ্করাচার্য্যের গঙ্গাস্তবে কল্পলতামিব বলে উল্লেখ আছে। কল্পতরুর মধ্যে রামানুজের জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রহ্মবাদের সমর্থন আছে। ভগবানের সৃষ্টিতে জীবের একটা ভূমিকা আছে। তাকে চাইতে হবে—লীলা-বিলাসের স্থান আছে—বৃন্দাবনলীলায় গোপিকাদেরও প্রয়োজন আছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের

প্রতি টান ছিল, এতে ভক্তির interaction বুঝাচ্ছে। ঠাকুর বলেছেন আমি কত শুনেছি, শাস্ত্র মালা করে গলায় পরেছি এই কথারও গভীর দ্যোতনা আছে—মালার কাজ ornamentation, যে পরে তাকে সুন্দর দেখায় আবার মালাকেও সুন্দর দেখায়।

"তিনিই মন বুদ্ধি অহংকার চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন।"
(শ্রীশ্রীঠাকুর)

তিনিই মন বুদ্ধি অহংকার চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন
তাই একাদশ ইন্দ্রিয় তাঁরি স্বরূপ ....
.........শুদ্ধ রূপে।

প্রার্থনা, নাম, ধ্যান নিষ্কাম কর্ম ইত্যাদি সহায়ে ইন্দ্রিয়দের শুদ্ধ করতে হবে, সুক্ষ্ম করতে হবে অনুলোম সাধনে ......
সেই শুদ্ধ ইন্দ্রিয়দের আবার সুক্ষ্ম প্রকাশ মুখে
আনতে হবে বিলোম সাধনে...
এই ইন্দ্রিয়ে ভগবৎ-আস্বাদন হয়।

শ্রীঠাকুরের বাণী "তিনিই মন বুদ্ধি অহংকার চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন।" তাঁর এই স্থূল প্রকাশের পথ বিলোম মার্গে। কিন্তু এই যে মনবুদ্ধি অহংএর প্রকাশ হয়েছে এর দ্বারা স্থূল ভোগই সম্ভব। কারণ স্থূল বাসনার বীজ নিয়েই তিনিই স্থূল রূপে প্রকাশিত হয়েছেন। আমরা যদি এই স্থূলত্ব ছেড়ে ভগবৎ-রস আস্বাদন করতে চাই তাহলে এই স্থূল ইন্দ্রিয়গুলিকে অনুলোম মার্গের সাধনে, প্রার্থনা, ধ্যান জপ-সহায়ে, নিষ্কাম কর্ম্মের মধ্য দিয়ে, সূক্ষ্ম করে নিতে হবে যথা ইন্দ্রিয়ের লয় হবে মনে, মনের লয় অহংকারে, অহংকারের লয় বুদ্ধিতে এবং বুদ্ধির লয় হবে ভগবৎ-তত্ত্বে। কিন্তু সমস্ত লয় হলে আস্বাদ করবে কে আর কাকেই বা করবে? তাই আবার এই সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গুলিকে ফিরিয়ে আনতে হবে তাদের শুদ্ধ প্রকাশমুখে। শুদ্ধ মন যখন শুধু বোধে বোধ মাত্র ক'রে তৃপ্ত হয় না তখনই শুদ্ধ ইন্দ্রিয়াদির প্রকাশ ভক্তের তৃপ্তির জন্য প্রয়োজন। তখন দৃঢ় ইচ্ছা সহায়ে মনকে হস্তাদিরূপে পুনঃ প্রকাশের চেষ্টা করতে হয়। প্রার্থনা

নাম ধ্যান সহায়ে দৃঢ় ইচ্ছায় মনে শুদ্ধহস্তাদির পুনঃ প্রকাশ হয় ও ভগবৎ অনুভূতির আনন্দ লাভ হয়। সাধনকালে কিছু শুদ্ধতা যখন লাভ হয় তখন দূর-দর্শন দূর-শ্রবণ ইত্যাদি হয়ে থাকে এবং যোগীদের নানারূপ সিদ্ধাই এসে পড়ে। পাশ্চাত্য দর্শনে (ফ্রয়েড প্রভৃতির মতে) এই দূর-দর্শনাদিকে অবচেতন মনের কার্য্য বলে এবং আরও বলে যে সমষ্টির অবচেতনা (ডাঃ জুঙ প্রভৃতির মতে) আমাদের ব্যক্তিগত অবচেতনায় মিশে আছে তাই এইসব ঘটনা কারো কারো মধ্যে প্রকাশিত হয়। কিন্তু সেগুলির প্রকাশের পথ প্রস্তুত হওয়া চাই—আবার তা পরিষ্কার থাকাও চাই। প্রাচ্য মন-যোগ-বিজ্ঞানে তার উপায়গুলিই পরীক্ষিত সাধনাঙ্গ, এক্সপেরিমেণ্টাল স্পিরিচুয়্যাল সাইকোলজী। এ পথে ভগবৎরস আস্বাদনের জন্য যে শুদ্ধ ইন্দ্রিয়াদি তৈরী হয় সে পথ, সে পথ পরিক্রমা, পথচারী প্রতীচির ঐসব সিদ্ধান্তের পারে।

"তিনিই পুরুষ তিনিই প্রকৃতি"। (শ্রীশ্রীঠাকুর)

তিনিই··· প্রকৃতি
তাই প্রকৃতি জড় নন...অন্তঃসংজ্ঞাযুক্তা
অন্তঃসংজ্ঞা (Unconscious অসীম শক্তির আধার
প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হতে হলে অন্তঃসংজ্ঞা
জাগ্রত করতে হবে, প্রবল করতে হবে ...
প্রজ্ঞাময় হতে হবে···সাধনসহায়ে।

প্রকৃতি জড় নন। গীতায় বলেছেন তিনি পরা-অপরারূপে বিরাজ করছেন। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর বলেছেন, তিনিই পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি। বৃক্ষলতাদি অন্তঃসংজ্ঞাযুক্ত। যেটুকু আমাদের প্রকাশ-চৈতন্যের অন্তর্গত তার চেয়ে অপ্রকাশ চেতন আরও গভীর আরও ব্যাপক আরও শক্তিসম্পন্ন। একথা স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ বলে গিয়েছেন। আমরা নিজেরা যদি এই অপ্রকাশ চৈতন্যকে সাধনসহায়ে প্রজ্ঞাময়রূপে পেতে পারি তবে বৃক্ষাদির চৈতন্যের সঙ্গে আমরা যোগসূত্র পেতে পারি।

"তিনি যেন চুম্বক আর ভক্ত যেন ছুঁচ, আবার
ভক্ত কখনো হন চুম্বক আর ভগবান হন ছুঁচ"।

গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসের কথার সঙ্গে কথামৃতের ঐ বাণীর অদ্ভুত সঙ্গতি রয়েছে। সক্রেটিস বলেছেন—তিনি নিজে অচঞ্চল থেকে আমাদের আকর্ষণ করেন।

সক্রেটিসের কথার সঙ্গে সঙ্গতি পাচ্ছি, তিনি যেন চুম্বক আর ভক্ত যেন ছুঁচ কথাটির মধ্যে, কিন্তু তিনি সক্রেটিসের কথাকেও ছাড়িয়ে গেলেন, সক্রেটিসের কথার ওপরের কথাও বললেন, আবার কখনো ভক্ত হন চুম্বক আর ভগবান হন ছুঁচ' এই বাণীটি বলে। চুম্বকের স্পর্শে লোহা চুম্বক হয়ে যায়। একথা বিজ্ঞানের এক প্রমাণিত সত্য। কাজেই ভগবৎ নামে ও চিন্তায় ভক্ত যে চুম্বক হবে একথা স্বতঃসিদ্ধ।

বিজ্ঞানে বলে, বিরাট এক magnetic field এ পড়লে একমাত্র কাঠ ইত্যাদি non-conductor পদার্থ ছাড়া যে কোনো ধাতু চৌম্বকত্ব লাভ করে, লোহার তো কথাই নাই। Steel সবচেয়ে বেশী magnetised হয়ে যায়। ভক্ত যেন এই steel metal। ভগবানের স্পর্শে সে চৌম্বক শক্তি লাভ করে ও ভগবানকেও আকর্ষণ করে।

পদার্থ বিজ্ঞানের আর একটি মত যে, লোহার মধ্যে যদি high voltage বিদ্যুৎ অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সাধারণ লোহাই পরিণত হয় বিরাট বৈদ্যুতিক চুম্বকে। সেজন্য সাধক বা ভক্ত সেই ব্রহ্ম-বিদ্যুৎ বা ভগবৎ বিদ্যুতের স্পর্শে লাভ করে বিরাট চৌম্বক শক্তি, আর ভগবানেরই শক্তিতে শক্তিমান হয়ে ভগবানকেই করে আকর্ষণ। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবতমুখে ভগবান বলেছেন—

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥

"এখান থেকেই সব" (শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত)

এখান থেকেই সব।
তাই সব ধরেই
এবং সবেতেই

পাওয়া যাবে তাঁকে···
ব্রাহ্মী সিসৃক্ষায়
ব্রহ্ম মণ্ডলে
ব্রহ্মেরই প্রকাশমুখে
যা হচ্ছে—
একের এই বহুলতা—বহুর এই ঐক্য
সাধক দেখবেন
ইষ্টরূপে
ইষ্টমন্ত্রে—এক স্বরূপে···
ইষ্টের এই সম্যগ্ দর্শনে—
চিত্তের এই সম্প্রসারণে
নিষ্পেষণের আশঙ্কা কম
আর তা—
মনের বৃত্তির, ধর্মের, স্বভাবের
অনুগ...

—০—

"ঈশ্বর সম্বন্ধে যে যতটুকু দেখেছে সে মনে করেছে, ঈশ্বর এমনি আর কিছু নয়।"

যার যেমন মনের আলো সে সেইরকম আলো তাঁর উপর ফেলে বলছে তিনি এই রকম। কেউ তাঁর উপর খণ্ডের আলো ফেলে বলছে তিনি খণ্ড, কেউ অখণ্ডের আলো ফেলে বলছে তিনি অখণ্ড। আমরা তাঁর সম্বন্ধে যা কিছু জানি তা অতি সামান্য, আর তা হ'চ্ছে আপেক্ষিক - রিলেটিভ। কারণ আমরা তাঁকে দেখছি আমাদের অহং-এর আলো দিয়ে। কাজেই সে জানা হচ্ছে রিলেটিভ। আমরা তাঁকে অখণ্ড বলছি সেওতো আমাদের চিন্তা দিয়ে। কাজেই অনন্ত বললেও ঠিক বলা হয় না। শ্রীঠাকুরের কথা, ঈশ্বর সম্বন্ধে যে যতটুকু

"নিত্য ঈশ্বর নিত্য ধাম"।

রামকৃষ্ণলোক

Mental ও physical dimension এর অতীত
স্থূল সূক্ষ্ম কারণের অতীত—
পঞ্চকোষ পঞ্চস্কন্দের অতীত—
নাম রূপাতীত—চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বের অতীত—
সর্ব্বাতীত—সর্ব্বাশ্রয়—শুদ্ধকৃপার এইলোক।

পদার্থ বিজ্ঞানের শেষ কথা, চারিটি মাত্রায় সবকিছু ঘটছে বা আছে। দেশ বা দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা আর কাল। বেদান্তে সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ পঞ্চকোষে অবস্থিত। যথা—অন্নময়, প্রাণময় (স্থূলদেহ), মনোময়, বিজ্ঞানময় (সূক্ষ্মদেহ) এবং আনন্দময় (কারণদেহ) কোষ। বৌদ্ধমতে সৃষ্টির বন্ধন পাঁচটি স্কন্দ—রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংখার, (সংস্কার) বিজ্ঞান। সাংখ্যের চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব প্রকৃতির রাজ্য। এই সমস্ত এবং মনোমাত্রা বা mental dimension অতিক্রম ক'রে গেলে রামকৃষ্ণ লোকে প্রবেশ সম্ভব। অবশ্য এ রাজ্য সর্ব্বাতীত হ'য়েও সর্ব্বময়। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, নামরূপের অতীত এ লোক সব মত-পথের লক্ষ্য। নিত্য ঈশ্বর নিত্য ধাম (শ্রীশ্রীঠাকুর)। শুদ্ধ কৃপা লভ্য নিত্য বৃন্দাবন এলোক।

"এমন জায়গা আছে যেখানে বরফ গলে না—
স্ফটিকের আকার।"

প্রত্যেক অবতারের নিত্য লীলা, নিত্য ধাম যদি থাকে তবে নিত্য ধাম বহু হয়। কিন্তু নিত্য বৃন্দাবন এক। এই নিত্য লীলা যেখানে হ'চ্ছে, সেখানে এক নিত্যরূপ তত্ত্ব আছে। সেখানে তিনি অনন্ত রূপে শান্ত হ'য়ে বর্ত্তমান। সেখানে শিবভক্ত তাঁকে শিব দেখবে, রামভক্ত রাম দেখবে, রামকৃষ্ণ ভক্ত রানকৃষ্ণ দেখবে। সবলোক সেই একেকেই দেখবে। সেখানে তিনি নিত্য রূপে বর্ত্তমান। এই নিত্য বৃন্দাবন, এখানেই নিত্য লীলা। ঠাকুরের যেমন বলা আছে, এমন জায়গা আছে যেখানে বরফ গলে না— স্ফটিকের আকার।

> "কি রকম জান, যেন সচ্চিদানন্দ সমুদ্র। কুল কিনারা নাই। ভক্তি-হিমে সেই সমুদ্রের স্থানে স্থানে জল বরফ হয়ে যায়, যেমন জল বরফ আকারে জমাট বাঁধে অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি সাক্ষাৎ হয়ে কখন সাকাররূপে দেখা দেন, আবার জ্ঞানসূর্য্য উঠলে সে বরফ গলে যায়।"

নিরক্ষর জ্ঞানসিন্ধু তো লেখাপড়া নেই, কিন্তু কেমন একটা বিজ্ঞান-সম্মত উদাহরণ দিলেন, বিজ্ঞানের যুগতো ; কাজেই এমন উদাহরণ দিলেন যাতে সকলেই বুঝতে পারে। তাঁর দয়ায় সবই সম্ভব, তিনি নিরাকার, আবার সাকার রূপ ভক্তের আকুতিতে ধরেন বৈকি যেমন জল ঠাণ্ডায় জমাট বাঁধে।

আমাদের এই মনই স্থূল বাসনার দ্বারা শরীর সৃষ্টি করে। প্রেত অবস্থাতেও যখন বাসনার শক্তি খুব প্রবল হয় তখন প্রেত শরীর ধারণ করে। তাছাড়া দেহ-ছাড়া হয়ে বেশীদিন থাকতে পারে না যতক্ষণ না আবার দেহধারণ করে জন্মায়। তাদের মানসিক চাহিদাই আবার স্থূল দেহের কারণ হয়। এটি হল স্থূল বাসনার রাজ্যের মানুষের কথা।

আবার ভগবানের চিৎ জ্যোতির রাজ্যেও সূক্ষ্ম সত্ত্বাটী ভাবঘনীভূত হতে হতে চিৎ সমুদ্রে জমাট বেঁধে ভেসে ওঠেন চিন্ময়রূপে, সে অবতার-রূপেও বটে বা কৃপার দর্শন দেবার সময়েও বটে। তবে ভগবানের ক্ষেত্রে আর সেটী স্থূল বাসনা বলা চলবে না, সেটি তাঁর কৃপার ইচ্ছা বা লীলার ইচ্ছা। আর সূর্যের সঙ্গে জ্ঞানের তুলনা করা হয়েছে সত্যিই জ্ঞানের মধ্যে আছে তেজ-প্রভাব আর ভক্তির সঙ্গে বরফের তুলনা করা হয়েছে। ভক্তির মাঝে দেখা যায় আপন করে নেওয়ার ভাব, বুকে জড়িয়ে ধরে নেওয়ার ভাব, স্নিগ্ধতা ও মাধুর্য, সে হিসেবে বরফের শীতলতার সঙ্গে তুলনা ভালই হয়েছে। তাছাড়া জ্ঞান তো সব গলিয়ে দেয়, জ্বালিয়ে 'নেতি' 'নেতি' করে উড়িয়ে দেয়।

> "কেউ কেউ মনে করে, বেশী ঈশ্বর ঈশ্বর করলে
> মাথা খারাপ হয়ে যায়—তা নয়। এযে সুধার হ্রদ,
> অমৃতের সাগর। বেদে তাঁকে 'অমৃত' বলেছে।
> এতে ডুবে গেলে মরে না, অমর হয়।"

ঈশ্বর হচ্ছেন সমস্ত কল্যাণ গুণের আকর কাজেই তাঁকে ডাকলে কি আর কেউ বেহেড অর্থাৎ পাগল হয়? সেই বিরাট চৈতন্যময় সত্তাকে চিন্তা করে কি কেউ চৈতন্য হারিয়ে পাগল হয়? তবে হঠাৎ কিছু করতে নাই। তন্ত্র সাধনায় যেমন এক রাত্রে সিদ্ধি লাভের পথ যদি কেউ নিতে যায়, তাহলে বিপদ হতে পারে, সেক্ষেত্রে অনেক সময় বিভীষিকা দেখে মাথা খারাপ হয়ে যায় আবার নানা সিদ্ধাই দিয়ে মা ভুলিয়েও দেন, কিন্তু ঠিকঠিক যোগ্য গুরু যদি লাভ হয় তন্ত্রসাধনাতেও বিশেষ ভয় থাকে না। তবে কথা হচ্ছে কি জানো, slow but steady হয়ে লেগে থাকা। কিন্তু হঠাৎ কিছু করতে নাই। গীতামুখে ভগবান বলেছেন 'শনৈঃ শনৈরূপরমেদ' ধীরে ধীরে মনকে নিরুদ্ধ করে যোগ-সাধনা করতে হয়। মনটাকে ধীরে ধীরে ঈশ্বর চিন্তার জন্য প্রস্তুত করতে হয়। তবে মন তৈরী হয়ে গেলে ঈশ্বর চিন্তায় অভ্যস্ত হয়ে গেলে, তখন নিরন্তর ঈশ্বর চিন্তায় ডুবে থাকলেও কোন ক্ষতি হয় না। blotting paper-এ করে কালি তুলে নিতে গেলে একটি কোনা দিয়ে ধীরে ধীরে soak করতে হয়, কিন্তু যদি কালির ওপর সমস্ত blotting paper-টী রাখা হয় তাহলে জেবড়ে যাবে। তেমনি প্রস্তুত না হয়ে হঠাৎ যদি চব্বিশ ঘণ্টা ঈশ্বরচিন্তা আরম্ভ কর, তাহলে মাথা গোলমাল না হোক খুব reaction হতে পারে। কয়েকদিন বাদে হয়ত আর ঠাকুরকে ডাকতে ইচ্ছাই করবে না। আর গীতামুখে ভগবান আসুরী তপস্যা, পূজা, উপাসনা, যজ্ঞাদির নিন্দা করেছেন। অহঙ্কারপ্রসূত ও কামনা-বাসনাদি চরিতার্থতার জন্য রাজস তপস্যার ফলেও ক্ষণস্থায়ী মুক্তিলাভ, ঈশ্বরলাভ, কিছুই হয় না। তাছাড়া শরীরকে অত্যধিক কষ্ট দিয়ে পরের অমঙ্গল সাধন জন্য মারণ, উচাটন ইত্যাদির জন্য বা

অত্যধিক কামনা চরিতার্থ করার জন্য যে তপস্যাদি বা ঈশ্বর উপাসনা, সেগুলিও গীতামুখে তামস তপস্যা বলে নিন্দিত হয়েছে। আর অশ্রদ্ধাযুক্ত তপস্যা পূজাদিসম্বন্ধে বলেছেন—

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চযৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত নো ইহ ॥

অশ্রদ্ধাপূর্বক তপস্যা, হোমাদি ইহলোকেও ফলপ্রসূ নয়, পরলোকেও ফলদায়ক নয়। তামসিক অশ্রদ্ধাযুক্ত তপস্যা বা অত্যধিক সকাম ও দম্ভযুক্ত রাজস তপস্যায় যে ঈশ্বর-আরাধনা, একটু বেশী হলে ক্ষতি আছে। কিন্তু নিষ্কামভাবে ঈশ্বরে ভালবাসা নিয়ে খুব বেশী করে ঈশ্বরকে ডাকলে অমঙ্গল কেন হবে? বেহেড্ কেন হবে? তিনি যে করুণাময়।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষুপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥

কাজেই অত্যধিক বিষয়-সঙ্গ থেকে কামনা, কামনাচরিতার্থ পথে বিঘ্ন হলে ক্রোধ, ক্রোধ অত্যধিক হলে মোহজন্মে, মোহ থেকে স্মৃতিভ্রংশ আর তার থেকেই প্রণাশ ঘটে। স্মৃতিভ্রংশ মানেই পাগল সেজন্য অত্যধিক কামনা-বাসনা, বিষয়-সঙ্গ এগুলি গৃহীরা পর্যন্ত avoid করবে। বরং ঠিক ধর্ম আচরণে প্রত্যবায় নাই, ক্ষতি নাই। কৃষ্ণ ভগবান বলেছেন প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে কাজেই দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর কতো সুন্দর কথা বললেন।

> "সব গোল মেটে, তিনিই আস্তিক, তিনিই নাস্তিক, তিনিই ভাল, তিনিই মন্দ, তিনিই সৎ, তিনিই অসৎ, জাগা, ঘুম এসব অবস্থা তাঁরই আবার তিনি এসব অবস্থার পার।"

তিনি আস্তিক, তিনিই নাস্তিক ইত্যাদি বলিতে কি বুঝায়? যাঁহারা অস্তিত্বে বিশ্বাসবান তাঁহাদের নিকট তিনি অস্তিত্ববান (আস্তিক) এবং যাঁহারা অস্তিত্বে বিশ্বাসবান নহেন তাঁহাদের নিকট

তিনিও অস্তিত্ববান নহেন (নাস্তিক)। আর একটা উত্তর হইতে পারে যে তিনিই এই সৃষ্টিতে আস্তিক, নাস্তিক, ভাল, মন্দ, সৎ, অসৎ ইত্যাদি নানারূপে লীলা করিতেছেন। একরূপে মায়ার ঘুম ঘোরে তিনিই অচেতনবৎ রহিয়াছেন—আবার তিনিই আর একরূপে চিরজাগ্রত।

> “শ্রীরামকৃষ্ণ বঙ্কিমের প্রতি—কেউ কেউ ডুব দিতে চায় না। —সচ্চিদানন্দ অমৃতের সাগর। আমি নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাস করেছিলাম, মনেকর যে একখুলিরস আছে, আর তুই মাছি হয়েছিস, তুই কোনখানে বসে খাবি? নরেন্দ্র বললে, আড়ায় কিনারায় বসে মুখ বাড়িয়ে খাব। আমি বললুম কেন? মাঝখানে ডুবে খেলে কি দোষ? নরেন্দ্র বললে তাহলে যে রসে জড়িয়ে মরে যাব। তখন আমি বললুম, ওরে সচ্চিদানন্দ রস তা নয়, এরস অমৃত রস, এতে ডুবলে মানুষ মরে না, অমর হয়।”

কথামৃতে এত জিনিষ আছে, এত জ্ঞানের কথা আছে যত পড়া যায় তত বুঝা যায়। এই যে কথা একখুলি রস কোথায় বসে খাবি? নরেন্দ্র বলল, আড়ায় (কিনারায়) বসে মুখ বাড়িয়ে খাব।

এটী শুনতে বেশ হাসির কথা। কিন্তু কত গভীরতা আছে কথার মধ্যে। প্রথম বেদান্তাদি দর্শনে আছে সচ্চিদানন্দ জ্ঞানের সমুদ্রে ডুব দিলে সমস্ত সত্ত্বা লোপ হয়ে যায় কিন্তু নরেন্দ্রনাথ surrender করে সমস্ত অহং সত্ত্বা, সমস্ত ব্যক্তিত্ব লোপ করতে চান না, তাতে ঠাকুর তাঁকে এমন তত্ত্বের সন্ধান দিলেন, যে তত্ত্ব নিরাকার নয়, চরম ব্যক্তিত্বপূর্ণ ঈশ্বর তত্ত্ব। এমন ব্যক্তিত্বপূর্ণ যেখানে ডুব দিলে কারো ব্যক্তিত্ব হারাবার সম্ভাবনা নেই সেখানে শরণাগত হয়ে ডুব দিলে individual ব্যক্তিত্ব, অহংসত্ত্বা সমস্তই থাকবে অথচ লয় হয়ে যায় কথামৃত বর্ণিত সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরতত্ত্বে তেমন যায় না—divine হয়ে যায়, মাধুর্যপূর্ণ হয়ে যায়।

এই একটা সহজ উদাহরণের মধ্যে কত গভীর রহস্য লুকিয়ে রয়েছে। গুরুর প্রীতির জন্যে সমস্ত বিলাস ত্যাগী সন্ন্যাসী জীর্ণ-মলিন

গৈরিক বাস অঙ্গে, কিন্তু তারই মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে তপস্যাপূত প্রশান্তি ও বুদ্ধির প্রখর দীপ্তি।

> "আমি সাকারবাদীদের কাছে সাকার, নিরাকার বাদীদের কাছে নিরাকার"।

এই কথাটার দুরকম মানে আছে। যে যে রকম ধরবে। একদিক দিয়ে হয় সাধারণ লোকের কাছে, যারা তাঁকে সাধু মহাপুরুষ বা একজন ধার্মিক লোক বলে মনে করে, তাদের মধ্যে যে সাকারবাদী তার কাছে ঠাকুর সাকারবাদী, আর যে নিরাকারবাদী তাদের কাছে ঠাকুর নিরাকারবাদী। আর একটা হয়, যারা তাঁকে ঈশ্বর বলে মানে তাদের মধ্যে যারা সাকারবাদী তাদের কাছে আমি সাকার আর নিরাকারবাদীদের কাছে আমি নিরাকার। অর্থাৎ যে সাকার ধ্যান করে, তাদের কাছে আমি সাকাররূপী ঈশ্বর আর নিরাকারের ধ্যান যারা করে তাদের কাছে নিরাকার ব্রহ্ম।

দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের কথার কিরকম প্রকাশভঙ্গী, কিরকম গভীরতা—Pantheism, Panentheism, ক্ষর, অক্ষর, Transcendent, Immanent, সগুণ ব্রহ্ম, নির্গুণ ব্রহ্ম সব কিছুই রয়েছে। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের পুরুষোত্তমযোগেও একথা আছে। তবে শ্রীকৃষ্ণ নিজের ভগবৎ সত্ত্বার কথা নিজেই বলেছেন। জোর গলায় বলে গেছেন। কিন্তু ঠাকুর mystic ভাবে বলেছেন। গীতায় পুরুষোত্তমযোগে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে ক্ষর, অক্ষর দুই ই বলেছেন। আরও বললেন যে অক্ষরের চেয়েও উত্তম বা পুরুষোত্তম।

দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর কিন্তু বলেছেন ক্ষর, অক্ষর এবং তারও পরের কথা তাঁর ইতি করা যায় না গীতার চেয়েও পরিষ্কার করে বললেন।

আর একটা কি মজা, যারা জ্ঞানী তাদের কাছে ঠাকুর কিছুতেই ধরা দিতে চান না। আমাকে স্বামী চিৎস্বরূপানন্দ বলেছিলেন, আমি এত চেষ্টা করেও ঠাকুরের ধ্যান করতে পারছি না। শেষকালে না পেরে আমি শ্রীমায়ের ধ্যান আরম্ভ করেছি। কিছুতেই ঠাকুর

জ্ঞানীর কাছে ধরা দেন না। তার কাছে ঠাকুর ঠিক নিরাকার। ওই যে বলেছেন আমি নিরাকারবাদীদের কাছে নিরাকার।

> **"যিনি সাকার, তিনিই নিরাকার, তিনি আরো কত কি ?"**

দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরটির কথায় কি গভীর দ্যোতনা—বিশ্বের ঠাকুর হয়ে বসবেন তো, কথার মধ্যেই সেটা বোঝা যাচ্ছে। 'তিনি' কথাটী ছোট্ট, কিন্তু এর মধ্যে লুকিয়ে আছে তাঁর অসীম রূপ। এই 'তিনি'ই গীতার পুরুষোত্তম যিনি ক্ষরের উর্দ্ধে, আর অক্ষরের চেয়েও উত্তম। এই যে কোন নাম বললেন না, বললেন শুধু 'তিনি', এর গভীর মানে ঈশ্বরের যে অনন্ত নাম, অনন্ত রূপ এই 'তিনি', কোন মতবিশেষের কোন ধর্ম-বিশেষের বিদ্বেষের কারণ হতে পারেন না। ইনি বিশ্বের ভগবান। 'তিনি' সত্তাটী জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের উপাস্য হতে পারেন, এই 'তিনিটী' সর্বনাম। কিন্তু 'তিনি' তত্ত্বটী মূলতঃ সেই বিরাট Personকেই বোঝাচ্ছে। সচল-অচল, সগুণ-নির্গুণ সমস্ত তত্ত্বই এর মধ্যে। কথামৃত যত পড়ি, তত বুঝি যে কি গভীর শক্তি নিয়ে এসেছিলেন। ভগবৎতত্ত্বটাকে এমনভাবে বলে গেলেন যে, দেশকালের গণ্ডী, কোন জাতিধর্মের গণ্ডী, কোন ভাষার গণ্ডী কিছুর মধ্যে ফেললেন না, সকলের গ্রহণযোগ্য করে বললেন।

"ইতি করিস না"।

তিনি জড় দৃষ্টিতে জড়া···
চেতন দৃষ্টিতে তিনি চৈতন্যময়ী ...
আরো প্রসারিত দৃষ্টিতে তিনি আরো কতোকি
"ইতি করিস না"··· (শ্রীশ্রীঠাকুর)

কেবলাদ্বৈতে তিনি নির্গুণ ; বিশিষ্টাদ্বৈতে তিনি সগুণ, বৌদ্ধদের তিনি শূন্য, Russel এর কাছে তিনি Neutral staff, বার্গসর মতে Elan vital, ঠাকুর বললেন ; তাঁর ইতি করিস না। সব হয়েও আরো কতো কি ;

"তাঁর ইতি করো না"।

শ্রীঠাকুরের "তিনি" তত্ত্ব হচ্ছে, রঙ্গতত্ত্ব—লীলাতত্ত্ব। তিনি নিজেই শঙ্করের মধ্য থেকে শঙ্করকে বলাচ্ছেন ব্রহ্ম নির্গুণ আবার রামানুজের ভিতর থেকে বলাচ্ছেন ব্রহ্ম সগুণ। এই রকম ক'রে তিনি তাঁর অনন্ত তত্ত্ব অনন্ত রূপে বা ভাবে প্রকাশ ক'রে গেছেন, যাচ্ছেন—যাবেন। তাঁর ভাবেরও ইতি নেই—তত্ত্বেরও ইতি নেই। শ্রীঠাকুরও বলতেন, তাঁর ইতি করোনা। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের "তিনি" তত্ত্ব দর্শনের উচ্চতমতত্ত্ব। ঠাকুর ব'লেছেন, তিনি সাকার নিরাকার আরো কত কি। তাঁকে বেদে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ব'লেছে। পুরাণে সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ বলেছে, তন্ত্রে সচ্চিদানন্দ শিব ব'লেছে। ঠাকুর অনেক স্থানেই তাঁকে 'তিনি' বলেছেন—নামহীন, রূপহীন, আবার ব'লেন তাঁর নিত্য সাকার রূপও আছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ভক্তদের বলছেন ঃ—

> ["যেমন একজন লোক পাঁচীলের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে, পাঁচীলের দু-দিকেই অনন্ত মাঠ সেই পাঁচীলের গায়ে যদি ফোকর থাকে পাঁচীলের ওধারে সব দেখা যায়। বড় ফোকর হলে আনাগোনাও হয়।" অবতারাদির আমি ঐ ফোকর-ওয়ালা পাঁচীল। পাঁচীলের এধারে থাকলেও অনন্তমাঠ দেখা যায়"।

ঐ ফোকরওয়ালা পাঁচীল কথাটি, ওটি ঠাকুরের সম্বন্ধে। তিনি অবতার। অবতারের পক্ষে ঐরূপ। তিনি জগদ্‌গুরু, তাঁর কথা স্বতন্ত্র। গুরুর মধ্য দিয়ে ছাড়া আমরা অসীমের পরিচয় জানা বা অসীমকে প্রত্যক্ষ করা এটি কোন মতেই পারি না। গুরুর মধ্য দিয়েই পারতে হয়, এইই উপায়। আমার তাই মনে হয় তিনিই উপায়—তিনিই উপেয়।

তবে এটিও জেনো—এই অপরিমেয় বিরাট গুরুশক্তি, গুরুপরম্পরা ক্রমেই অনন্ত কাল ধরে বয়ে চলেছে। তাই তাঁর চরণের রেণু আমরা যত ছোটই হই তবু যদি এই শেকলের সবচেয়ে নীচের পাৎটী ধরে

থাকতে পারি, তবে একটার পর একটা পাব ধরে ধরে শেষকালে তাঁরই কাছে পৌঁছে যাবো। গুরুতত্বটা বড় রহস্যময় জিনিষ। ঐ যে স্বামিজী ঠাকুরের অদর্শনের পর গাজীপুরে পওহারী বাবার কাছে দীক্ষা নিবার মনস্থ করলেন যখন, তখন প্রতি রাত্রিতে এক আধবার নয় একুশবার ঠাকুর স্বামিজীর মাথার কাছে এসে দাঁড়ালেন। এমনই বার বার একুশবার তাঁকে দেখা দেওয়ার পর স্বামী বিবেকানন্দ পওহারী বাবার নিকট দীক্ষা সম্বন্ধে সঙ্কল্প এককালে ত্যাগ করে বলে উঠলেন, "জন্ম জন্ম দাস তব দয়ানিধে।"

> "মানুষে তিনি বেশী প্রকাশ। মাঠের আলের
> ভিতর ছোট ছোট গর্ত্ত থাকে তাদের বলে ঘুটী।
> ঘুটীর ভিতর মাছ কাঁকড়া জমে থাকে।"

আল যেন সগুণ ব্রহ্ম, সগুণ ব্রহ্মের মধ্যে অবতারের (গর্ত্ত) প্রকাশ আবার অবতারের মধ্যে দিয়েই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়—ঈশ্বর এস্থলে মাছ, কাঁকড়া ইত্যাদি।

> "স্বামিজীকে ঠাকুর বললেন, যে রাম, যে কৃষ্ণ
> সেই এবারে এই দেহে রামকৃষ্ণ—তবে তোর
> বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।"

স্বামিজী তো প্রথমে ব্রহ্ম সমাজে যোগ দিয়েছিলেন। তারপর জ্ঞানপন্থী ছিলেন। বেদ বেদান্তও পড়েছিলেন। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের ইচ্ছা, নির্বিকল্প সমাধিতে ডুবে থাকার সাধ এ তো ছিল। কিন্তু বেদান্ত মতে তো অবতার নেই 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' জীব ব্রহ্মৈব নাহংপরো।' এসব তো বেদান্ত বাক্য—তো জগতের অস্তিত্ব ব্যবহারিকভাবে মানা হলেও আত্যন্তিক সত্ত্বা মানা হয় নি। এই সৃষ্টি, জীব জগৎ সব তো বেদান্ত মতে মায়া। কাজেই সেখানে অবতারের কথা ওঠে না। ওটি ভক্তিশাস্ত্রের কথা। তাই বললেন 'তবে তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।' ঠাকুর আবার একজায়গায় বলছেন, আমার বাল্যকাল থেকে ভাব, সমাধি এসব হোত আবার তখনই দীনতা প্রকাশ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ ভগবানও এমনি ভাবে লীলা করেছিলেন। দুর্য্যোধন বাঁধতে গেলেন শ্রীকৃষ্ণের ক্ষমতা জানা

সত্ত্বেও- শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে ভুলিয়ে দিয়েছিলেন বলেই তো। মানুষ-দেহধারণ করে জীবের মত সুখ দুঃখ বরণ করে লোকবৎ লীলা করেন তো। সেইজন্য চার পাশের মানুষ তাঁকে ঠিক ধরতে পারে না, জেনেও ভুলে যায় তাঁর স্বরূপ—এসবই তাঁর ঠাকুরালী।

"ভগবানের প্রেম দুর্লভ"।

ঈশ্বরে প্রেম এটী জীবের হয় না কাজেই বোঝাও যায় না। তবে বাড়ীতে একটী ছোট্ট সুন্দর বাচ্চা থাকলে, তাকে থেকে থেকে দেখতে ইচ্ছা করে, বুকে জড়িয়ে ধরতে চুমো খেতে মনে হয়—এই প্রীতিটি বু'ঝ। এই রকম ঈশ্বরের জন্য মন ছটপট করা, প্রীতি এসব ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন হয় না। সমস্ত বস্তুর ওপর প্রীতির instinct, সেটী ঠাকুরের দেওয়া instinct আর ঈশ্বর বা ইষ্ট বস্তুর ওপর প্রীতির instinct, এটীও ঠাকুরের বিশেষ কৃপা, এটীর জন্য প্রার্থনা করতে হয়। আর কৃপা যদি নিজে থেকে করেন সে কথা তো আলাদা। গোস্বামীপ্রভু প্রথম জীবনে শ্রীকৃষ্ণ মানতেন না, ভক্তিও ছিল না, গোঁড়া ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্ত ছিলেন, কিন্তু পরবর্ত্তী জীবনে মস্তবড় ভক্ত হয়ে গেলেন এত নাম করতেন যে, অঙ্গে ও আসনে নাম অপনিই ফুটে উঠত। আর ভগবানের নামে অজগর বৃত্তির মত নিয়েছিলেন। পরের দিনের জন্য কিছু সঞ্চয় করতেন না। আকাশবৃত্তি নিয়েছিলেন। গৃহদেবতা শ্যামসুন্দর নিজে থেকে কৃপা করে বার বার দর্শন দিয়ে ক্রমে গোস্বামী প্রভুর জীবনে আনলেন আমূল পরিবর্ত্তন।

"হাততালি দিয়ে নাম কর"।

হাততালি দিয়ে নাম করা কেন? যতক্ষণ মানুষ স্থূল আছে, তার তমোগুণ যখন প্রবল, ততক্ষণ স্থূল নামেই ভাল ফল দেবে কারণ তখন সূক্ষ্মভাবে মনে মনে জপ ক'রতে গেলে ঝিমিয়ে প'ড়বে; পারবে না।

আর একটা দিক আছে সমষ্টিকল্যাণ এবং ব্যষ্টির কল্যাণ। মনে মনে নাম ক'রলে, আত্মায় আত্মায় নাম ক'রলে, তার আত্মার খুব উন্নতি হবে। কিন্তু সমষ্টির কল্যাণ আবার আছে, সেখানে যাতে সকলে শুনতে পায়, এমনভাবে করা। সে নাম তাদের ওপর কাজ

ক'রবে খুব তাড়াতাড়ি। মনে মনে নাম ক'রলে স্থূলভাবে তাদের কাজ দেবে না। Group Mind বলে একটা কথা আছে (Le Bon)। একস্থানে যখন অনেকে নাম করে তখন নামের একটা আলাদা সত্তা প্রকাশ হয়। অনেক সময় পাঁচজনে জপ ধ্যান ভাল হয়। কারণ সেখানে সমষ্টি মনের একটা ছোঁয়াচ আছে।

"ঈশ্বরের নামে মানুষ পবিত্র হয়। তাই নাম কীর্ত্তন অভ্যাস করতে হয়।"

অভ্যাসযোগ আমাদের রেখে যেতে হবে, মন তো চট্ করে সংযত হয় না। চট্ করে তো হরি অনুরাগ আসে না, তার জন্য চাই নিত্য-দিনের অভ্যাস। প্রথম প্রথম তো মন বসতেই চাইবে না, খালি ঘড়ির দিকে নজর যাবে কতক্ষণে ওঠবার সময় হবে—নিত্যপূজা, জপ, মানস-আরতি এগুলো রেখে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এগুলোর খুব শুভ ফল। নিত্য নিত্য এগুলোর অভ্যাস ধর্ম্মরাজ্যের শিখরে ওঠার Peg পোঁতা। ধর্ম্মের পথ ক্ষুরধার পথ, তাই নিত্য নিত্য পূজা, পাঠ, স্মরণ, মনন, জপ এগুলো রাখলে আখেরে কাজ দেবে, বিরাট ভয় থেকে, পতন থেকে মুক্তি দেবে। প্রথম প্রথম রস পাওয়া যায় না এগুলোতে, তখন মনে হবে, যাই অমুক কাজটা আছে করে আসি, আজ তাড়াতাড়ি উঠি স্কুলের কাজ, কি কোলকাতা বেড়ানো আছে কিংবা আজ শরীরটা ভাল নাই ইত্যাদি নানা বাধা মনে আসবে, কিন্তু জোর করে এগুলো রাখলে তখন মনে আপনি প্রীতির সঞ্চার হবে। তখন ঠিক পূজার সময় মন টানবে, ভাল লাগবে না পূজা না করে, সন্ধ্যায় হয়ত ঠাকুরকে সাজিয়ে আরতি করলে মনে মনে, সেটা যদি নিত্য রাখার চেষ্টা করা যায় তাহলে ঠিক সন্ধ্যা হলে আর অন্য হিজিবিজি জিনিষের জন্য মন টানবে না। ঠিক মন তখন সেই চিন্তায় মগ্ন হয়ে যাবে। (বোধানন্দের দিকে তাকিয়ে) তার মা অত বৃদ্ধা হয়ে পড়েছেন, ভাল করে সোজা হয়ে বসতে পারেন না, তবুও অষ্টকালীন স্মরণটি ঠিক আছে। বেলা হয়ে গেছে বাড়ীর লোকেরা খেতে ডাকছে, তখন বলছেন, 'দাঁড়া অমুক চিন্তা এখনও বাকী

আমার রাধারাণীর কৃষ্ণের এখনও এই কাজটা হয়নি। বেলা পড়ে আসছে, তবুও খাবার চেষ্টা নাই। এই হচ্ছে বৈষ্ণবদের সেবা—সকলে রাখার চেষ্টা করবে। এগুলো অনেক সময়ে বিশেষ ভয় থেকেও রক্ষা করে। এক ফকীর রোজ সন্ধ্যায় এক মসজিদে 'চিরাগ' অর্থাৎ প্রদীপ জ্বালিয়ে দিত। ওদের তো পূজা আরতি কিছু নাই। তো সে একদিন বিশেষ অন্যায়ের পথে পা বাড়িয়েছে আর একটু হলেই সে অতল অন্যায়ে নেমে যেত, ঠিক সেই সময়ে সেই পরিস্থিতিতেই সেখানকার গৃহকর্ত্রীর দাসীকে 'চিরাগ জ্বলাদো' কথাটি উচ্চারণ করতে শুনলো। যেই 'চির'গ' কথাটি উচ্চারণ করেছে আর যায় কোথায়, ফকীরের তখন মনে পড়ে গেছে মসজিদে চিরাগ দেওয়ার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, আজ তার 'চিরাগ' দেওয়া হয়নি। যেই মনে পড়া অমনি সে সেখান ছেড়ে দৌড় দিল—আর সঙ্গে সঙ্গে সে অন্যায়ের হাত থেকেও রক্ষা পেয়ে গেল। এই সামান্য অভ্যাস—রোজ মসজিদে প্রদীপ দেওয়া—সেইটুকু কাজই তাকে কতখানি পতন থেকে রক্ষা করল। তেমনি সকলে অভ্যাসযোগ রাখার চেষ্টা করবে।

"ঈশ্বরকে না জানলে ক্রমশঃ ভিতরের চুঁনোপুঁটি বেরিয়ে পড়ে"।

আমাদের অবচেতন মনে বহু অসামাজিক অনৈতিক চিন্তা লুকিয়ে আছে। সাধারণ মানুষের অবচেতন মনে লুকিয়ে থাকা ঐ চিন্তাগুলি প্রশ্নের মাধ্যমে বের করে দিতে পারা যায়, এটি ফ্রয়েড প্রভৃতির মত! এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীন জিনিষগুলিকেই চুনোপুটির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। অবচেতনতত্ত্ব বড় রহস্যাবৃততত্ত্ব। মানুষ বহুযুগ ধরে আহার, নিদ্রা, হিংসা চঞ্চলতা এসব করেছে সেগুলোই সংস্কার আকারে অবচেতনে জমা হয়ে আছে আর আমাদের বহুকাজেই এই অবচেতন মন প্রেরণা দেয় কিন্তু যার বিবেকশক্তি যত জাগ্রত সে তত অবচেতনকে জয় করতে পারে। আমরা সাধারণতঃ যে সমস্ত আচরণ সামাজিকভাবে করতে লজ্জা পাই, ভয়পাই, অথচ সে সম্বন্ধে পুরো বাসনাটি আছে, আমাদের জাগ্রত অবস্থায় সেই আচরণগুলি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না—বাহিরে

আমরা আচরণও করি না ; কিন্তু আমরা যখন ঘুমিয়ে পড়ি তখন মনের বিবেকশক্তি ঘুমিয়ে পড়ে কাজেই অবচেতন রাজ্য তখন আত্মপ্রকাশ করে। অপূর্ণ ইচ্ছা পূরণ করি, অসাধ্য কাজও অবচেতন মনের স্বপ্নের মাঝে সাধন করি। হয়তো কোন সাধু সাধু-সমাজে রসগোল্লা খেতে লজ্জা পেলে, ঘুমের মধ্যে রসগোল্লা খেল, কি অবচেতনের আত্মপ্রকাশে গৃহী হয়তো স্বপ্ন দেখল অপরের জিনিষ কেড়ে নিচ্ছে, চুরি করে নিচ্ছে ইত্যাদি—। আবার অবচেতন মনের প্রভাব বেশী হলে অনেক সময় রাগ বাড়ল, লোভ বাড়ল তখন জাগ্রত অবস্থাতেও নিজেকে ঠিক রাখা গেল না, তখন হয়তো খুব খানিকটা চেঁচামেচি করলে কি হয়ত কারোকে মেরেই বসলে কি চুরি করে ফেললে ; কিন্তু এগুলো জয় করতে বিবেকশক্তি অর্থাৎ সৎ অসৎ বিচারশক্তি বাড়াতে হবে। আমাদের নিজের নিজের মনের পিছনে প্রহরী লাগিয়ে রাখতে হবে, মনের গতি কোন্ দিকে analysis করতে হবে। তারপর জাগ্রত অবস্থাতেও যেন অসাধু জনোচিত অসামাজিক বিবশ চিন্তাতে মন ডুবে না যায়। এছাড়া জপ, ধ্যান, পাঠ, স্বাধ্যায় এইসব সৎসঙ্গে যতটা সময় পারা যায় কাটাতে হবে, আর মনকে অবচেতন জয় করার autosuggestion ও দিতে হবে repeatedly. আমি সংস্কার মুক্ত হব ; বাসনা মুক্ত হব, ভগবানকে চাই এসব ধারণা দৃঢ়মূল করতে হবে। আর অবচেতনকে জয় করার মস্ত বড় উপায় হচ্ছে—ঘুমটাকে যতটা পারা যায় কমানো ও ঘুমের আগে জপ, প্রার্থনা করা, আর যখনই ঘুম ভাঙবে তখনই উঠে বসে জপ বা চিন্তা করবে। আর অবচেতনের আত্মপ্রকাশ সম্বন্ধে রেকর্ড রাখতে হবে। এমনিভাবে দীর্ঘদিন করতে করতে দেখবে ঘুমের মাঝে ভাগবৎ চাহিদা, নাম স্মরণ এগুলো থাকবে, অশুভ কিছু দেখলেই ঘুম তখন আপনিই ভেঙে যাবে। ঘুমের মাঝেও তখন আধ্যাত্মিক চেতনা বা বিবেক বোধ সজাগ থাকবে।

“ঈশ্বরের দরজায় অহঙ্কারের গুঁড়ি পড়ে আছে ইত্যাদি— ভূতসিদ্ধ ভূতকে চুল সোজা করতে বলে ভূতের হাত থেকে রেহাই পায়” ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেমন সহজ কথায় কঠিনতত্ত্ব অহংতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন —ভূতের কথা খুব প্রিয়—ভয় পেলেও শুনতে ইচ্ছা করে। তার মাধ্যমে জটিলতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া।

চুলের সঙ্গে অহঙ্কারের উপমা খুব স্বাভাবিক ও সুন্দর। চুল সূক্ষ্ম অহঙ্কারও সূক্ষ্ম এত সূক্ষ্ম যে কোথায় জমে আছে বুঝাই যায় না। অহঙ্কার পারিপার্শ্বিকের উপর নির্ভরশীল। একজন লোক বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকে বিভিন্ন ভাবে অহঙ্কার প্রকাশ করে। চুল সোজা করা যায় না—অহঙ্কারও। ভূতসিদ্ধ সবকিছু করতে পারে কিন্তু একগাছি চুল সোজা করা ভূতের অসাধ্য। শুধু গুরুইষ্টের কৃপায় অহঙ্কার যায়।

> "ঈশ্বরের কৃপায় তীব্র বৈরাগ্য হলে, এই কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি থেকে নিস্তার হতে পারে। তীব্র বৈরাগ্য কাকে বলে? হচ্ছে হবে, ঈশ্বরের নাম করা যাক্, এসব মন্দ বৈরাগ্য, যার তীব্র বৈরাগ্য তার প্রাণ ভগবানের জন্যে ব্যাকুল, মার প্রাণ যেমন পেটের ছেলের জন্য ব্যাকুল। যার তীব্র বৈরাগ্য সে ভগবান ভিন্ন আর কিছু চায় না? ·····"

কথামৃত মুখে ঠাকুরের কথা বলার একটা আলাদা type হচ্ছে এক কথা বলতে বলতে আর এক কথায় Jump করে যাওয়া—ভাবে থাকতেন তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর যে তীব্র বৈরাগ্যের কথা বললেন ওটি সংসারীদের চট করে হয় না। তবে সংসারেতে থাকতে গেলে ভক্তি আশ্রয় করে থাকতে হবে এটি ঠাকুর সাধারণের উপযুক্ত করে বললেন।

তীব্র রোক, তীব্র বৈরাগ্য এগুলির মধ্যে একটি dynamic force আছে, অর্থাৎ ঠাকুর dynamism-এর পক্ষপাতী ছিলেন—তবে সাধু হতে গেলে এটি চাই-ই চাই।

'তাঁর কৃপা হলে আর ভয় নাই।"

তাঁর কৃপার আশায় আমরা যদি চেয়ে না থাকি তাহ'লে আমরা তা ধরব কেমন করে? যেমন নৌকা করে আমাদের যেতে হলে আমাদের তৈরী হয়ে বসে থাকতে হবে কূলে এসে। কারণ মাঝির ঠিক নাই কখন সে আসবে। তেমনি তাঁর কৃপা আসে অহেতুকভাবে।

যে কোন সময়েই কিন্তু আমরা তৈরী থাকি না। সেইজন্য আমরা তপস্যাদি ক'রে তৈরী হবো, আমাদের কৃপা পাবার যখন সময় হয় তখন আমরা তা ধরতে পারি। তাঁর সময় হয়েই আছে কিন্তু আমাদের সময় হয় না। আবার আধারও তৈরী করবেন তিনিই, তপস্যাদি করিয়ে একটু এগিয়ে নেন। কারণ তাঁর কাছে আমাদের তপস্যাদি কিছু নয়।

"ঈশ্বর দর্শন হয় একথা কাকেই বলি কে শুনে" ?

এটির দ্যোতনা কি ? The world is too much with us. বিষয়ের সঙ্গে অভিঘাতপূর্ণ আমাদের জীবন, কাজেই নির্ব্বিষয় মানসিক অবস্থা আমাদের কাছে কষ্টকর বোধ হয়। ঈশ্বরের তত্ত্ব হল Transcendental truth। যেমন মৌন থাকা—তখন বিষয়ের অভিঘাত কমে আসে। শুধু মন নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয়—এই বিষয় স্বল্পতায় যেন মন হাঁফিয়ে উঠে। তাই highest truth নিয়ে চিন্তা করা বা তা নিয়ে পড়ে থাকার সংখ্যা এতকম। ঘুড়ির গল্পে ২/১ টী কাটে ইত্যাদি। তাই গীতায় বলা হয়েছে অরতির্জনসংসদি।

"মানুষের ভিতর যখন ঈশ্বর দর্শন হবে তখন পূর্ণ জ্ঞান হবে।"

মানুষ ছাড়া আমরা আর কিছু ভাবতে পারি না তা নয়; সাধারণতঃ আমাদের সর্ব্বোত্তম চিন্তা নিজেদের ছাড়া আর এগোয় না। কিন্তু নিম্নস্তরের লোকেরা সূর্য ইত্যাদির পূজা করে। এরা তথাকথিত অল্পবুদ্ধি। কিন্তু মানুয়ের বুদ্ধির বিকাশ যখন হল তখন সে নিজের স্বরূপে দাঁড়াতে চেষ্টা করতে লাগল। আর নিজের স্বরূপে তাঁকে চিন্তা ক'রল—তারপর ব্রহ্ম চিন্তা। শ্রীঠাকুর যেমন বলেছেন, "মানুষের ভিতর যখন ঈশ্বর দর্শন হবে তখন পূর্ণজ্ঞান হবে।"

মানুষের ভিতর একটা প্রবৃত্তি আছে, স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়া—সমুদ্রের ঢেউয়ের বিরুদ্ধে সাঁতার দেব—পাহাড়ের ওপর উঠব—প্রকৃতিকে জয় ক'রব নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ক'রব। ছোট ছেলে হাত পা নাড়ছে, এ

একটা জয় ক'রবার প্রবৃত্তি থেকে। আমাদের ভেতর ব্রহ্ম রয়েছেন, জাগ্রত ভগবান র'য়েছেন তিনি যে বিশ্বের অধিরাজস্বয়ম্ভু।

> **"যদি ঈশ্বর সাক্ষাৎ দর্শন হয়, তাহলে ঠিক বলা যায়। যে দর্শন করেছে, সে ঠিক জানে ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার আরো কত কি তা মুখে বলা যায় না।"**

কতকগুলো কাণা একটা হাতির কাছে এসে পড়েছিল ; একজন লোক বলে দিল, এ জানোয়ারটার নাম হাতি। তখন কাণাদের জিজ্ঞাসা করা হল— হাতীটা কি রকম? তারা হাতীটাকে স্পর্শ করতে লাগল। একজন বললে হাতিটা একটা থামের মত। সে কাণাটি কেবল হাতীর পা স্পর্শ করেছিল ; আর একজন বললে, হাতীটা একটা কুলোর মত। সে কেবল একটা কাণে হাত দিয়ে দেখোছল। এইরকম শুঁড় কি পেটে হাত দিয়ে যাঁরা দেখেছিল তারা নানাপ্রকার বলতে লাগল। তেমনি ঈশ্বর সম্বন্ধে যে যতটুকু দেখেছে সে মনে করেছে—ঈশ্বর এমনি, আর কিছু নয়।

ঈশ্বর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ কেউ কোনদিন জানতে পারে না। জীব কখনও ঈশ্বরতত্ত্ব সম্পূর্ণ জানতে পারে? একবিন্দু সাগরের জল কখনও সমস্ত সাগরটাকে জানতে পারে? কাজেই আমাদের জানা ওই কাণাদের হাত বুলিয়ে জানার মতই, কত সহজ উপমা দিয়ে সকলের বোধগম্য ক'রে জী.বর জ্ঞানের সীমা বুঝিয়ে দিলেন। আরও একটা কথা, ঠাকুর ওই চারটা কাণার খণ্ড খণ্ড জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠা দিলেন না। পাশ্চাত্য দর্শনে ওয়্যারদিমার, কফ্‌কা প্রভৃতির মতেও জ্ঞান সামগ্রিক। Gestalt ইত্যাদি এঁরা বলেন জ্ঞানঅর্জনের পিছনে আছে একটা প্রজ্ঞা বা instinct। আমরা সামগ্রিক ভাবে দেখে তবেই জ্ঞান অর্জন করি। It is total reaction to a total response। হেগেল, বার্গশ এঁরাও সমগ্রকেই প্রধানস্থান দিয়েছেন। খণ্ড দৃষ্টি তাঁদের কাছে ভ্রান্ত।

কাজেই ভগবৎ তত্ত্ব সম্বন্ধে খণ্ড খণ্ড করে জানার চেষ্টাও ভ্রান্ত। আমি যতটুকু জেনেছি তার বাইরে তিনি কিছু নন, এটা মনে করাও ভ্রান্ত ধারণা। তিনি অনন্ত হয়েও সান্ত, আরো কত কি?

"শ্রীবাস ষড়ভুজদর্শন করছেন, স্তব করছেন, -ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া ষড়ভুজদর্শন করিতেছেন—। গৌরাঙ্গের ঈশ্বর আবেশ হইয়াছে। তিনি অদ্বৈত, শ্রীবাস হরিদাস ইত্যাদির সহিত ভাবে কথা কহিতেছেন। গৌরাঙ্গের ভাব বুঝিতে পারিয়া নিতাই গান গাহিতেছেন

কই কৃষ্ণ এল কুঞ্জে প্রাণ সই!

শ্রীরামকৃষ্ণ গান শুনিতে শুনিতে সমাধিস্থ হলেন।"

শ্রীশ্রীঠাকুর থিয়েটার দেখতে গিয়েছেন এবং অভিনয় দেখে সমাধিস্থ হয়েছেন। থিয়েটার দেখতে গেলে মনটা একমুখী হয়ে যায়, তখন শরীরের অন্যসব দ্বারগুলি নিস্তেজ হয়ে যায়, শরীরের কোন যন্ত্রণা হচ্ছে— ভাল থিয়েটার দেখার সময় সে সব মনে থাকে না। অন্য কথা পর্যন্ত তখন কাণে যায় না। সাধারণ ভাবুক মানুষদেরই তখন চোখে জল আসে, আর ঠাকুর তো স্বয়ং ভগবান—অনুভূতির মূর্ত্তবিগ্রহ. কাজেই থিয়েটার দেখে এত অভিভূত হলেন, যে শেষে বললেন আসল নকল এক। আসলে তো সব ইন্দ্রিয়গুলির অনুভূতি অনুভব করে মন যখন কোন ইন্দ্রিয় মাধ্যমে বিশেষ করে চক্ষু ইন্দ্রিয় সহায়ে কোন একটী বিষয়ে একাগ্র হয়, তখন অন্যসব ইন্দ্রিয়রাজির অনুভূতিগুলি নিস্তেজ হয়ে যায়। একথা পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানেও স্বীকার করেছে।

তেমনি আবার ভগবৎ দর্শনের সময়ও সমস্ত ইন্দ্রিয়রাজি নিস্তেজ হয়ে যায়, নিস্ক্রিয় হয়ে যায়,বায়ু আপনি স্থির হয়ে যায়। খুব দু-চারটি আধার স্বামিজীর মত আধার ছাড়া ভগবৎ দর্শনের পর আর বেশী কাজকর্ম করতে পারে না। তখন হয় শরীর পড়ে যায় না হয় ওই ভগবৎ-আনন্দ ও নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে। তেমনি তোমরা যখন ধ্যান করবে তখন এমনভাবে মানসচক্ষে ঠাকুরকে দর্শন করবার চেষ্টা করবে অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি যেন নিস্তেজ হয়ে যায়।

"ঈশ্বর আনন্দ সর্ব্বোত্তম স্তর"।

মানুষের আনন্দের স্তর বিভাগ আছে। এক টাকা দু'টাকা যখন রোজগার করে তখন তাতে তার আনন্দের পূর্ণতা হয় না। তাই

আরো চেষ্টা করে পরে হয়তো পায় এবং আনন্দও বেশী হয়। কিন্তু ঠাকুর বলেছেন ঈশ্বর আনন্দ সর্ব্বোত্তম স্তর। সে আনন্দ সে পায়নি তাই এই ক্ষুদ্র বিষয়ে আনন্দ পেতে চায়; কিন্তু আনন্দ ঠিক পায় না।

তাই আমাদের প্রার্থনা করা "হে ঠাকুর! তোমার আনন্দের নেশাটি দাও।"

তাঁর কাছে ঠিক ঠিক চাইলে, ঠিক ঠিক পাবে। ঠাকুরই এদিক ওদিক করে ঠিক করে নেবেন।

কিন্তু খাঁটি হতে হবে। আর নাম করে যাও। মনে রেখো তোমাদের নিজেদের জন্যে শুধু নয়। একটা দাগ রেখে যেতে হবে। বহুর কল্যাণের সঙ্গে তোমরা জড়িয়ে আছো, একটা বড় আদর্শ থাকলে সহজে নীচে নেমে যেতে পারবে না।

ইংলণ্ডের মন্ত্রী কার্ডিনাল উলসে, রাজা হেনরী যা বলতেন তাই ক'রেছেন, অন্যায় অনেক ক'রেছেন, তারপর তাকেই একদিন বের ক'রে দেওয়া হল। তখন তিনি ব'ললেন এতদিন তোমার যে দাসত্ব ক'রেছি সেই দাসত্ব যদি ঠাকুরের জন্যে ক'রতুম তা'হলে এ দুর্দ্দশা হ'ত না। তা'হলে বৃদ্ধ বয়সে আমায় তিনি পরিত্যাগ ক'রতেন না। আর কিছু নয়, আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখতে হবে যা ক'রছি ঠাকুরের জন্যে ক'রছি। না হলে ঐ দশা হবে। কর্মের ভেতর ইষ্টনাম্ থাকা চাই, কর্মের ভেতর ইষ্ট-চিন্তা থাকা চাই। এখুনি যদি মৃত্যু হয়, তখন কি হবে, তখন কি অন্ধকারে হাতরাবো? "সর্ব্বদা চিন্তা রাখতে হবে যে এই মুহূর্ত্তে যদি মরতে হয় ঠাকুরের কাছে চলে যাব। ঠাকুরের চরণাশ্রয় নিলে আখেরে ঠিক থাকে! জপের আনন্দ, ধ্যানের আনন্দ, ইষ্টকে নিয়ে আনন্দ। সংসার 'ত' আঘাত দেবেই কিন্তু ভগবানের আনন্দ পেলে আর কিছু গায়ে লাগে না। এই আনন্দটুকু পেলে আর আঘাত গায়ে লাগে না।

ভাগবত আনন্দের কাছে বিষয় আনন্দ আলুনি লাগবে। ভোগের জিনিষ সামনে পড়লে মনে তখন যন্ত্রণা হবে, মনে হবে এই

বুঝি আমার শান্তি ভঙ্গ করলে, তখন কেমন যেন জ্বালা সুরু হয়।

> **"মিছরির পানা খেলে চিটে গুড়ের পানা তুচ্ছ হয়ে যায়"।**

এইটি জেনো, একটি ভোগ আর একটিকে আনে। তাই প্রথম থেকে এই ভোগকে কৃমি কীটের বস্তু, হেয়বস্তু ভেবে যখন ত্যাগ করে চলবে তখন এতে আর আনন্দ পাবে না। একবার সত্য-শিব-সুন্দরের টান সৃষ্টি করতে পারলে আর হেয় জিনিষে লোভ হবে না। যেমন ঠাকুর বলতেন মিছরির পানা খেলে চিটে গুড়ের পানা তুচ্ছ হয়ে যায়। তোমরা যত এই মাটির ঊর্দ্ধে উঠবে তত দেখবে কত আনন্দ ঊর্দ্ধ লোকের। যিনি ভিতরে শিব আছেন তিনি চান না যে পদদলিত হবেন। তাই আমরা সব ক্ষেত্রে জয়ী হতে চাই, এগিয়ে যেতে চাই। আমাদের মনকে করতে হবে absorbent, আকর্ষণী শক্তিময়। আমাদের মনে সৃষ্টি করতে হবে বিরাট প্রেমের আকর্ষণী শক্তি। যা কিছু সৎ, সুন্দর, পবিত্র, মহান তাই প্রাণায়াম ও নাম সহায়ে মনের জোর করে আমাদের সত্ত্বায় টেনে নিতে হবে। যেমন এই আকাশ থেকে উদারতা টেনে নিতে হবে, ফুলের থেকে পবিত্রতা টেনে নিতে হবে, ঠাকুরের কাছ থেকেও খানিকটা শক্তিও টেনে নিতে হবে!

> **"১ সের চালে ১৪ গুণ খই হয়। দোকানী চালের রেকে যাতে ইন্দুর না খায় তাই মুড়কি করে রেখে দেয় মুড়কির সোঁদা গন্ধে ইন্দুর মুড়কি খেয়ে যায় চাল খেতে পারে না।"**

সংসারের আনন্দের চেয়ে ঈশ্বরের আনন্দ অনেক গুণ বেশী কিন্তু মানুষ সামান্য আনন্দ নিয়ে ভুলে থাকে, সংসারের সুখে আমরা অভ্যস্ত বলে বুঝতে পারি না নামামৃতে কত গুণ অধিক আনন্দ আছে। Platoর ভাবজগৎ এবং Aristotleএর বাস্তব জগতের একটি ছবি মনে পড়ছে। Plato উপরের দিকে চেয়ে আছেন যেন বলছেন ভাব

জগৎই সব, Aristotleএর দৃষ্টি জগতের দিকে। ঠাকুর বল্লেন সংসার ছাড়বে কেন ? গিরিশ ঘোষ, নাগমহাশয় এঁদের সংসার ছাড়তে দিলেন না, নাগমহাশয়কে বল্লেন জনক ঋষির কথা। ঠাকুর দুইই নিলেন ভাবজগৎ ও বাস্তবজগৎ। ভাবলে হতবাক হতে হয় যিনি ছেলেবেলা থেকে ভাবজগতে বিচরণ করতেন তিনি এই সমস্ত জাগতিক বিষয়ে কি করে জানলেন—দেখ এই কথায় Axiology বা value theory যা আজকাল Philosophyতে applied হচ্ছে, ঠাকুর তাকে সাধন জগতে spiritual experiment এ নিয়ে এলেন। বল্লেন সংসারে থাক কিন্তু value যেন ঠিক থাকে। যেমন ইন্দুর ১৪ গুণ আনন্দ ছেড়ে একগুণ আনন্দে ভুলে থাকে তেমন হয়ো না। ইন্দুরে স্বভাব ত্যাগ করতে বল্লেন।

"ঈশ্বর লাভ করলে তাঁর বাহিরের ঐশ্বর্য তাঁর
জগতের ঐশ্বর্য ভুল হয়ে যায়।"

তাঁকে দেখলে তাঁর ঐশ্বর্য্য মনে থাকে না, ঈশ্বরের আনন্দে মগ্ন হয়ে ভক্তের আর হিসাব থাকে না। এইখানে ভক্তের কাছে জ্ঞানীর বেশ তফাৎ হয়ে যায়। জ্ঞানী তাঁর গুণ অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য ধরে চলে, যেমন জ্ঞানীর ধ্যান অনন্ত আকাশরূপের চিন্তা, না হয় সত্যস্বরূপ এইরূপ যে কোন একটা গুণ চিন্তা করে চলা। যেমন ব্রাহ্মসম্প্রদায়, তাহাদের প্রার্থনা এইরূপ—হে ঈশ্বর তুমি আকাশ করিয়াছ, তুমি এই পৃথিবী করিয়াছ। তুমি চন্দ্র সূর্য্য সৃষ্টি করিয়াছ। বৈদিক যুগেও এইরূপ প্রার্থনা ছিল। কিন্তু ভক্তের কাছে তাঁর ঐশ্বর্য্য চোখে পড়ে না। ভক্ত শুধু তাঁকেই মধুররূপে চায় এবং তাঁকে দেখে ছোট্ট প্রেমের ঠাকুররূপে।

"যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি বাড়ী যায়।
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।"

নিত্যানন্দ প্রভু হচ্ছেন বৈষ্ণব সমাজের আদি গুরু। তাই নিজের গুরুকে তুলনা করা হচ্ছে নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে। শিষ্যের দিক থেকে গুরুর কোন দোষ ধরতে নাই। কোন ছাত্র যদি শিক্ষকের দোষ ধরে

তো তারই ক্ষতি। কাঠিয়াবাবার কথা শোন। তারাকিশোরবাবু তখন কলিকাতা হাইকোর্টের ভাল উকিল। কিছুদিনের মধ্যে Justice হবার কথা—কিন্তু হঠাৎ সব ছেড়ে দিয়ে বৃন্দাবনে কাঠিয়াবাবার আশ্রমে এলেন। এখন তিনি একদিন দেখেন যে, কাঠিয়াবাবা তাঁর একজন ব্রহ্মচারীর সঙ্গে বাজারের জিনিষ নিয়ে খুব যাচাই করছেন। তাঁর তখন মনে হল, এ আবার কি রকম সিদ্ধ সাধু। দর কষাকষি করছেন। তখন কাঠিয়াবাবা বুঝতে পারলেন তাঁর অন্তরের কথা, আর বললেন—আমি এ রকম আচরণ মাঝে মাঝে করি লোক তাড়ানোর জন্য—যা সব বিরক্ত করে—অসুখ-বিসুখ সারিয়ে দাও ইত্যাদি, আর ওই সমস্ত লোক আমার এই আচরণ দেখলে অনেকে সরে পড়বে।’ গুরুর আচরণ, গুরুকরণের পর অবিশ্বাস করার উপায় নাই। অবিশ্বাস হচ্ছে—a kind of disease of the sole। ন্যাবালাগলে যেমন চারিদিকে হলদে দেখে তেমনি অবিশ্বাসও একটা রোগ।

“শাস্ত্র গুরুমুখে শুনে নিতে হয়।”

শাস্ত্র অর্থাৎ যা থেকে আমরা শাসিত হই। যে সব গ্রন্থের অনুশাসন দ্বারা কি ক’রে ভগবৎ লাভ হবে, মুক্তি হবে জানা যায় তাই হচ্ছে শাস্ত্র। সাধারণতঃ বেদাদি আঠারটি শাস্ত্র প্রসিদ্ধ। আবার শাস্ত্র বলতে প্রস্থানত্রয়, গীতা, উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র। দু’ নৌকা কর’লে চ’লবে না। হয় গুরু নিষ্ঠা রাখতে হবে নয় শাস্ত্র নিষ্ঠা রাখতে হবে। গুরুর অসন্তোষজনক কাজে শাস্ত্র বিচার ক’রলে চলবে না। ঠাকুর বলেছেন, শাস্ত্র গুরুমুখে শুনে নিতে হয়। সৎগুরু যা করবেন তাতে শিষ্যের কল্যাণ হবে। ইষ্ট, গুরু, শিষ্য ও শাস্ত্র একমুখী হওয়া চাই। বিমুখ শিষ্যকে গুরু সুবিধামত ঘুরিয়ে নিয়ে যান। যেমন গিরীশ ঘোষকে ঠাকুর বললেন “আচ্ছা তোমাকে কিছু ক’রতে হবে না। বকলমা দাও।” এখন ‘বকলমা’ বা শরণাগতিই তার পক্ষে তপস্যা। গুরুকৃপা লাভ করতে হলে তাঁর মতানুসারে চ’লতে হবে। আর সৎগুরুর বাণী শাস্ত্রের সঙ্গে মিলবেই। যদি মনে হয় মিলছেনা,

সেটা আমাদের অহংপ্রসূত ভ্রান্তি মাত্র। সৎগুরুর নির্দ্দেশ মত চলিলে ইষ্ট ও মহাপুরুষদের কৃপা লাভ সহজ হয়।

"গুরুকৃপা হলে আর কোন ভয় নাই।
একটু সাধন করলেই গুরু বুঝিয়ে দেন, এই-এই"।

কৃপা মানেই হচ্ছে তাঁর অহেতুক করুণা, যার কোন condition নাই, তাহলে আবার একটু সাধন করলেই এই কথাটি কেন বললেন? তপস্যা বা সাধন তা'হলে দাঁড়ায় কোথা, তার প্রয়োজন কি? ভগবৎ কৃপা, গুরুর কৃপা সর্ব্বদা কৃপাই-তপস্যা বা সাধনার অপেক্ষা রাখে না, তবু তপস্যা, সাধনা এসব থাকলে কৃপা ধরার সুবিধা হয়, কৃপা ধরার প্রস্তুতিটা হয়। ওপর থেকে কৃপা একটা আছে, আবার তোমার ভিতর যে জীবভূত সনাতন আছেন তাঁরও কৃপা আছে, কাজেই তোমার ভিতর থেকে কৃপার দরকার—সেটা হচ্ছে তপস্যা। এতে কৃপা ধারণের প্রস্তুতি।

"গুরু বাক্যে বিশ্বাস"।

বিশ্বাসের তিনটি ভাগ আছে চিন্তা, কৃতি ও বোধ। Thinking, feeling ও willing মনোবিজ্ঞানে এটি বলে। চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা এই তিনটী factor আছে বিশ্বাসের মতে। যখন তুমি কিছু বিশ্বাস কর, তখন তার মধ্যে থাকে চিন্তা অর্থাৎ সেই বিশ্বাস্য বস্তু সম্বন্ধে চিন্তা, তারপর সেই বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে তোমার বোধ বা অনুভূতি থাকা চাই, আর থাকে ইচ্ছা, সেই বস্তু বা বিষয়টি তুমি বিশ্বাস করতে ইচ্ছা কর, তবেই তুমি বিশ্বাস কর। যেমন সূর্য্য উদয় দেখছ, সে সম্বন্ধে চিন্তা করছ এটি সূর্য্য তারপর তেজ, আলো, বর্ণ এসব অনুভব করছ, তখন তুমি গভীর দৃঢ়তার সঙ্গে অর্থাৎ দৃঢ় ইচ্ছার সঙ্গে বলছ, হ্যাঁ সূর্য্য আছে বা সূর্য্য উঠছে। কিন্তু ভগবৎ বস্তু সম্বন্ধে একটু বিশেষ কথা হচ্ছে, সে সম্বন্ধে আদৌ চাই শ্রদ্ধা অর্থাৎ আস্তিক্য বুদ্ধি। তিনি আছেন, এই বিশ্বাস আনতে হবে বা রাখতে হবে। তাঁকে চিন্তা করতে হবে, তাঁকে যিনি জানবার পথে সাহায্য করছেন সেই গুরুবাক্যে চাই গভীর

বিশ্বাস। গুরু নির্দ্দিষ্ট পথে সাধনাও খুব প্রয়োজন তবে গভীর বিশ্বাস হলে বেশী খাটতে হয় না এ কথা ঠাকুর বলেছেন। কিন্তু গুরু বাক্যে বিশ্বাস বা ভগবৎ বস্তু সম্বন্ধে বিশ্বাস আমাদের জোর করে এই বিশ্বাস রাখতে হবে। ওদেশের চিন্তাশীল দার্শনিক জেমসের মতে 'will to believe' দৃঢ় ইচ্ছা সহায়ে বিশ্বাস করতে হবে। এই জোর করতে করতে আমাদের দৃঢ়তা আসতে পারে। কৃপার ধারাও আসা সহজ হয়। ভগবৎ বস্তুতে দৃঢ়তা সহায়ে বিশ্বাস করে সাধনা করে পাওয়া এটি হচ্ছে বিশ্বাসের Subjective দিক। আর সেই বিশ্বাস ও সাধনার পরিপুষ্টি সাধন করতে ভগবৎ কৃপা হয়, ভগবৎ করুণা বর্দ্ধিত হয়—এটি হচ্ছে objective দিক। দৃঢ় আস্তিক্য বিশ্বাস নিয়ে এগোলে, তাঁকে চিন্তা করলে এর মধ্যে চিন্তা ও ইচ্ছা প্রধান হল, কিন্তু তিনি যখন কৃপা করে দর্শন দেন, স্পর্শ করেন, তখন জাগে গভীর অনুভূতি। কাজেই আমাদের কথা হচ্ছে দৃঢ় ইচ্ছা সহকারে ভগবানের নাম চিন্তা করে যাওয়া, বিশ্বাস রেখে যাওয়া, তখন সফল হইবে হরি করুণা বলে।

"বিশ্বাসে কি না হয়?"

এই বিশ্বাস হচ্ছে instinct, আত্যন্তিক বৃত্তি, সহজাত প্রবৃত্তি। যার বিশ্বাস নাই তাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানো হলেও বিশ্বাস হবে না। আর যার আছে, তার কখনও যাবার নয়। বিশ্বাস হচ্ছে সরল প্রবৃত্তি—অবিশ্বাস রোগটা একটা ব্যাপক রোগ হয়ে পড়েছে। যেমন আজকাল Thrombosis ইত্যাদি রোগ খুব ব্যাপক হয়ে পড়েছে। যার বিশ্বাস নাই, তাকে হাজার বললেও হবে না। (শঙ্করের প্রতি) বুঝতে পারছ, বর্ত্তমানে যা যুগের হাওয়া পড়েছে, তাতে যদি তোমার কারুর প্রতি অবিশ্বাস থাকে, তবে তাকে পাঁচ টাকা চাইলেও তুমি দিতে পারবে না। কিন্তু যার উপর তোমার বিশ্বাস আছে, তাকে তুমি অনায়াসে পাঁচ হাজার টাকা দিতে পার।

সুবর্ণ বণিকরা নাকি নিজের বাপকেও বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস অনেক রকম। সমাজগত, ধর্মগত, ব্যক্তিগত—বিভিন্নরকম।

যুগের প্রভাবও বিশ্বাসের উপর অনেকটা কার্য্যকরী হয়। বিজ্ঞানের দিক দিয়েও বিশ্বাস আছে যদি আইনষ্টাইন কোনও কথা বলেন, তাহলে সকলেই তা বিশ্বাস করে নেবে। কেউ তাকে challenge করতে পারবে না। এই আমাদের ঘরের লোক Sir J. C. Bose যদি বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন কথা বলে থাকেন, তাহলে লোকে অনায়াসে বিশ্বাস করে নেবে। কিন্তু যদি একজন উচ্চদরের সাধু বলেন যে, আমি ভগবৎ দর্শন করেছি, তাহলে লোকে উড়িয়ে দেবে। বলবে—হুঁ ঈশ্বর দর্শন হলে বুঝি লোকে বলে বেড়ায় ? সমাজের উপর বিশ্বাসের একটা stamp আছে—আগে লোকের অসুখ-বিসুখ হলে সামান্য একটু তুলসী পাতা বা তুলসী তলার মাটি খেলেই ভাল হয়ে যেত, ওষুধের বড় একটা দরকারই হত না, কিন্তু এখন আর লোকে তা মানবে না, এখন injection না হলে লোকের মন ভিজবে না।

আবার একটি বিপরীত স্রোত—একটা under current ও বইছে। ভগবৎ বিশ্বাসের গভীরতা কমে গেছে সত্যিই, কিন্তু একটা ভাসা ভাসা বিশ্বাসের ভাব বা সাময়িক ভাবে একটু গভীর বিশ্বাস সমষ্টি মনে এখনও দেখা যাচ্ছে আগের মত থাক আর নাই থাক—তবে ঘরে ঘরে দূর্গা পূজার ভীড়ও বেড়ে গেছে। আবার দেখা যায় পরীক্ষার সময় লাখ লাখ ছেলে পরীক্ষা দিচ্ছে—আর সাধারণত দেখা যায় পরীক্ষার সময় ছেলেদের ঠাকুর দেবতার প্রতি অন্ততঃ ভয়েও ভক্তি আসে। এরও একটা দিক আছে আগে এত ছেলে পরীক্ষাও দিত না, আর সমষ্টিগত ভাবে এত ছেলে প্রার্থনাও করত না। কিন্তু অন্ততঃ পরীক্ষার জন্যেও দূর্গাপূজা ও সরস্বতী পূজায় এদের খুব ভক্তি (করে)-এও একটা দিক—সেই সময়টুকুতে বাবা মার ওপর ভক্তি বাড়ে—এও একটা দিক।

গঙ্গার একূল ভাঙে তো ও কূল গড়ে—এও হচ্ছে ভক্তির সমষ্টিগত দিক।

বৈষ্ণব গ্রন্থে আছে "বিশ্বাসে মিলায়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।" কেবল

বিশ্বাস। কাণ্ট বলেছেন যে, আমি যদি বিশ্বাস করি যে আমার পকেটে ১০০=০০ টাকা আছে তাতে কি কাজ হবে? তার উত্তরে বলাযায় ওটা হচ্ছে জাগতিক বস্তু, আর ঈশ্বর হচ্ছেন অতীন্দ্রিয় রাজ্যের বস্তু। তুটীকে এক করা চলে না।

"বিশ্বাসে মিলায় বস্তু"।

বিশ্বাস মনের একটি অবস্থা। এমন একটি ভাইব্রেসন (vibration) যা মনকে উর্দ্ধ হতে উর্দ্ধমুখে নিয়ে যায়। যেমন কাল সূর্য্য উঠবে এটি যদি আমরা বিশ্বাস না করি তাহলে কালকের দিনটা আসবে কিনা তারই তো স্থিরতা নাই। কোন কাজই তাহলে হয় না, চুপচাপ বসে থাকতে হয়। প্রত্যেকটি জিনিষের বিশ্বাস আমাদিগকে উর্দ্ধ হতে উর্দ্ধপানে নিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বাস ও জ্ঞান এক, এবং বিশ্বাস ও ঠাকুর এক। শ্রীঠাকুর বলেছেন "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু"। সবেরি আদতে বিশ্বাস, অন্তেও তাই। তবে যা কিছু সৎ, চিৎ ও আনন্দ তাতেই বিশ্বাস রাখতে হয়। শ্রদ্ধা মানে তিনি আছেন এই বিশ্বাস— উপনিষদে আছে শ্রদ্ধদেব মনুতে (ছাঃ ৭। ১৯)। তাঁতে বিশ্বাস আগে নাহলে কিছুই দাঁড়ায় না। বৈষ্ণবশাস্ত্রে "বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।" আর পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান মতে Belief বলতে চিন্তার উপর (cognitive side—চিন্তার দিকে) জোর দেওয়া হয় আর faith বলতে ক্রিয়ার উপর (conative side, ইচ্ছার দিকে) জোর থাকে (J. ward).

সাধুসঙ্গে শ্রদ্ধা কেন হয়? তাঁরা তো ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী, তাঁকে নিয়েই পড়ে আছেন। সাধুদের মন, প্রাণ, অন্তরাত্মা অবিরত তাঁরই চিন্তায় রত, কাজেই তাঁদের কাছে গেলেই তাঁদের সঙ্গ ক'রলেই সাধারণ লোকের ঈশ্বরে শ্রদ্ধা জন্মে। সাধুরা হ'চ্ছেন বিশ্বাসের পূর্ণ প্রতীক। তাঁদের তিনি ছাড়া তো আর কিছুই নেই। যেমন একটি বিরাট আগুনের কাছে গেলেই আপনি আগুন জ্বলে যায়।

"চাই ব্যাকুলতা"।

একটি স্থান-কাল-পাত্রে সুরের লীলা একটি মাত্র।
স্থান-কাল-পাত্রে ভূমার প্রকাশ হলে
সুরও হয়ে যায় ভূমার স্বরূপ!
এই ভূমার সুরই বিশ্বলীলার সুর .. ....
পুরুষোত্তমের বংশীধ্বনি।
চির পুরাতন অথচ চির নূতন.... ...
চির অচল অথচ চির চঞ্চল
চির আপন হয়েও চির গোপন
প্রাণপুরে বাজে ... ..আবার বাজে বহুদূরে।
এরই অসীম চাওয়া ..... এরই অসীম পাওয়া।
ব্যাকুল হলে অসীম চাওয়া,
হ'য়ে যাবে অসীম পাওয়া।
তাই দক্ষিণেশ্বরে পুরুষোত্তম ব'লেছেন—
......চাই ব্যাকূলতা ....

অসীম ব্যাকুলতা—

কোন একটি দেশ, কাল বা পাত্রে যে সুর বাজছে, সেটি খণ্ড সুর, ব্যষ্টি সুর। সকালে প্রভাতী, সন্ধ্যায় পূরবী কোন লোকের কাছে সুখের সুর, কারো কাছে দুঃখের কাহিনী সুরু হয়েছে। এই ভাবে যে খণ্ড সুর জগৎ জুড়ে বাজছে এর পিছনে বিরাট দেশ কালে এক অখণ্ড সুর আছে, সেটি বিশ্বলীলার সুর, পুরুষোত্তমের সুর। আমাদের এই খণ্ড দেশকালকে ভূমায় নিয়ে যেতে হবে, তখনই আমাদের খণ্ডসুর অসীম হয়ে পড়বে। আমরা যদি প্রভাতের সুরকে সারা দিনই রাখতে পারি তবে সারা দিনে এক অখণ্ড প্রভাতই এক অখণ্ড সুরই থেকে যাবে। আবার সেই সুরকে প্রসারিত করে যদি সারা জীবনেই রাখতে পারি, তবে জীবনের সুর হয়ে যাবে এক অখণ্ড প্রভাতী সুর। আমরা যদি আনন্দের সুর সারা জীবনই রাখতে পারি দেশ কাল পাত্র নিরপেক্ষে, তবে সেই আনন্দম্, সেই নিত্য বৃন্দাবন,

নিত্য কৃষ্ণ, নিত্যলীলা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। আমাদের দেশ কাল ও পাত্রে যদি ভূমার প্রকাশ হয়, তবে খণ্ড সুরই অখণ্ড অসীম পুরুষোত্তমের বংশীধ্বনিতে রূপায়িত হবে।

তিনি সৃষ্টি-লীলায় এই খণ্ডসুরের বিলাস করছেন কিন্তু আমাদের এই খণ্ডসুরের বিলাস না চেয়ে সেই অখণ্ড-সুরের বিলাসই চাইতে হবে। জীবনে এই বৃহৎ এই ভূমার সুর বাজাতে হলে চাই ব্যাকুলতা।

এই ভূমার সুর, এই সুরব্রহ্ম পুরুষোত্তমের বংশীধ্বনি।

এই সুর অসীম—এ সুর অনন্ত, এর বিচ্ছেদ নাই। এ সুর বাজছে বহুদূরে—আবার অতি নিকটে, প্রাণের মাঝে, এ সুরই আবার অখণ্ডে ওতঃপ্রোত। শ্রীঠাকুরের কথায় 'এ সুরই শব্দ ব্রহ্ম···অনাহত শব্দ। সেই শব্দ-কল্লোল ধরে ধরে গেলে, তার প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম তার কাছে পৌঁছান যায়—তাকেই পরমপদ বলেছে" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত) 'যত্র নাদ বিলীয়তে'—উপনিষদ।

এ সুরই বিশ্বাতীত, এ সুরই বিশ্বানুগত। এই চির-চঞ্চলকে পাশ্চাত্যের দার্শনিক বার্গশ নাম দিয়েছেন ইলানভাইট্যাল। একে শুধু ধরে নেওয়া চাই—আর তার জন্যে চাই অসীম ব্যাকুলতা। কারণ অসীম-পাওয়া যেখানে, সেখানে একান্ত প্রয়োজন অসীম চাওয়ার। শ্রীঠাকুর তাই বলেছেন. 'এগিয়ে পড়'। আমাদের এগিয়ে পড়তে হবে এবং এই অসীম চাওয়ার সৃষ্টি করতে হবে—গুরু ইষ্ট প্রার্থনা নাম ধ্যান ও তপস্যা সহায়ে। নিত্য বলতে হবে আমি চাইনা এই খণ্ডসুরের লীলা যা নিত্য ভেঙে যাচ্ছে, আমি চাই সেই সুর যে সুর কখনও ভাঙেনা, কখনও হারায় না, ফুরায় না—অনন্ত যার বিস্তার অসীম যার প্রকাশ।

"ব্যাকুলতা দ্বারা ঈশ্বর লাভ হয়।"

ঠাকুরের উত্তর Straight, কোন তত্ত্ব কথা নয়, Philosophy তো নাই, সোজা, সাদা কথা।

কেউ যদি তৃষ্ণার্ত্ত হ'য়ে এক গ্লাস জল চায় তবে সে তা পাবেই। যেখানেই হউক পাবেই, এমন কি খর মরুভূমিতেও। কিন্তু যদি

এই গঙ্গার ধারে বসে আমি যদি মনে মনে জল চাই—তবে গঙ্গা বয়ে যাবে আমি তা পাব না। আচ্ছা, একটা material want যদি এভাবে পূরণ হয় তবে কেউ যদি ভগবানকে চায় ব্যাকুলভাবে, সেকি তাঁকে পাবে না ? যিনি আমাদের এত কাছে এত আপনার তাকে যদি সত্যি সত্যি ব্যাকুলভাবে চাই তবে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। কিন্তু তাঁকে কে চাচ্ছে ? তাঁর জন্যে কে ব্যাকুল হচ্ছে ?

আচ্ছা এই ব্যাকুলতা হয় না কেন ? কারণ তিনি এই Instinct দেন নি ? একে সাধন করে পেতে হয়। লীলার জন্যে এই চাইদা তিনি আমাদের দেননি। ব্যাকুলতা কিভাবে হয় ? মেরে ধরে (নিজেকে) এই ব্যাকুলতার সৃষ্টি করতে হয়। যীশু Practical ছিলেন তাই শিষ্যকে জলের নীচে ধরেছিলেন। আমিও প্রথম প্রথম বলতাম—জলের নীচে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা জপ না হওয়া পর্য্যন্ত ডুবে থাকবে। Practical Philosophy ও Practical Religion এক নয়। Philosophy মানে যার মধ্যে illogical কিছু নেই, যেমন পরাভক্তি ও পরাজ্ঞান এক। এ হল Philosophical truth কিন্তু তা Practical Religion নয়। যেমন ত্রৈলঙ্গস্বামী তিনি পরাজ্ঞানী নিশ্চয়ই কিন্তু তাঁকে ত ধেই ধেই করে নাচতে দেখিনি। আবার মীরাবাঈ ত্রৈলঙ্গস্বামীর মত স্থানু হয়ে পড়ে থাকেন নি। আবার মহাপ্রভু নেচে কেঁদে একাকার। স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে একবার নাচতে বলা হোল—একটু নাচলেন—তারপর সমাধি। এই হল Practical Philosophy থেকে Practical Religion এর তফাৎ।

> "কিছুদিন নির্জ্জনে থাকতে হয়। বুড়ি ছুঁয়ে ফেললে আর ভয় নাই। সোনা হলে তারপরে যেখানেই থাক। নির্জ্জনে থেকে যদি ভক্তিলাভ হয়, যদি ভগবান লাভ হয় তাহলে সংসারে থাকা যায়।"

সাধুদের ওইটি খুব লক্ষ্য রাখতে হবে, সঙ্গ দোষ যেন না হয়।

সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ—নিত্য নিত্য কোন বস্তুর সঙ্গ করতে করতে মন সেই বিষয়ে মোহগ্রস্ত হয়ে যায়—নিত্য নিত্য রসগোল্লার দোকানের কাছ দিয়ে যেতে যেতে মন তখন ঠিক রসগোল্লা খেতে দৌড়বে অবশ্য বলে নাকি যারা দোকান করে, তারা রসগোল্লা খায় না—সেটা হচ্ছে Extreme Point এর কথা। প্রথম দিকে খুবই খাওয়া হয়, তারপর দীর্ঘদিন পরে অবশ্য অরুচি আসে তাই বলেছেন—মাঝে মাঝে নির্জ্জন বাস করার কথা—ওই যে দিন কয়েক, কি কয়েক ঘণ্টা নির্জ্জনে থেকে জপ ধ্যান করা, তাতেও মনের ক্ষমতা ফিরে আসে। নিত্য নিত্য ভোগের সঙ্গ করতে করতে, জগতের সঙ্গ করতে করতে মনটা ঠিক বিকারী রোগীর মত হয়ে যায়। বিকারী রোগীর বিকারের ঘোরে যখন মনের চিন্তা শক্তির কোন ঠিক থাকে না, তখন চিৎকার করে ওঠে—এত খিচুড়ী খাব, এত জল খাব ইত্যাদি ইত্যাদি, তখন উত্তম বৈদ্য বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ সব করবে—এখন রস মরুক তখন সবই করবে। তারপর যখন রস মরে তখন কি আর রোগী বলে এত খাব, তত খাব। মন তো তখন normal হয়ে যায় তেমনি বিশেষ করে সাধুদের মধ্যে বেশীরভাগ এখন এত স্কুল, এত বোডিং, এত হাসপাতাল ইত্যাদি করব এই বাসনা, সে শরীর জখম হয়ে গেলেও ভ্রূক্ষেপ নাই। তারপর যখন বয়স হয়ে আসে, শরীর অক্ষম হয়—বাসনারস শুকিয়ে আসে, তখন আর কেউ কি বলে, এই করব, ওই করব—এখন ওমুককে জিজ্ঞেস কর যদি আর high school করবে কি না? দেখবে এখন আর কোন জবাবই দিতে পারবে না—মন এখন বিকারের অর্থাৎ অসুস্থতার জন্যে খুব lower status এ নেমে গেছে। ঠাকুর অনেকরকম দেখেছেন—fever mixture কখন খেতে হয় সব জানতেন, তাছাড়া সর্ব্বোপরি ভগবান তো, কাজেই ঠাকুর অনেক বুঝেই বলেছেন মাঝে মাঝে যেমন করে হোক সব ছেড়ে সরে যেয়ে কেবল ভগবানের নাম করতে হয়। এই তো ছেলেদের যখন একলা ঘরে বসাই নিরন্তর জপ ধ্যান করতে, তখন সত্যিই মুখে একটা সাত্ত্বিক ভাব ফুটে উঠে। এছাড়া

নির্জন বাসের একটা বিশেষদিক আছে—বিখ্যাত পদার্থতত্ত্ববিদ (Physicist) Louis Broglis প্রমুখ অপরাপর পদার্থতত্ত্ববিদগণ বলেন আমরা সকলে এক তরঙ্গায়িত বিশ্বে বাস করছি। We are living in a universe of waves and the waves are nothing but vibrations of various lengths. Sir Arther Eddington প্রমুখেরও এই মত।

আমাদের শরীর ও মনের আবেগ বা অনুভূতিকেই ধরা যেতে পারে এক একটি vibration বা কম্পন। Accoustics বা শব্দ বিজ্ঞান বলে যে, স্পন্দিত বস্তু যে কম্পন বা বেগ সৃষ্টি করে, তাকে স্থায়ী করতে গেলে চাই এমন একটি বস্তুর সাহায্য, যাতে হতে পারে resonance বা অনুরণন। তেমনি আমাদের দৈহিক বা মানসিক আবেগ, অনুভূতি, বাসনা, কামনা, বহিঃপ্রকাশের জন্যে যদি কোনো resonant body বা অনুরণণের সহায়ক বস্তু না পায়, তাহলে হয় তা সঙ্গে সঙ্গে থেমে যাবে, অথবা স্বল্প প্রকাশের পর তা স্তিমিত হতে হতে লীন হয়ে যাবে। আমাদের দেহ মনের কামনা, বাসনা, ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি ইত্যাদির vibration গুলি আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ভোগ্যবস্তু ইত্যাদির মধ্যে থাকলে resonant body পাবে, আর অনুরণিত হতেই থাকবে কিন্তু যদি আমরা নির্জ্জনে সরে যাই, তাহলে সেই vibration গুলি resonant bodyর অভাবে আপনিই স্তিমিত হয়ে আসবে। সাধক যদি সেই 'vibrationless vibration' অথবা 'uniform vibration' অথবা ব্রহ্ম বস্তু বা ভগবদ্‌বস্তু লাভ করতে চায়, তাহলে তো তাকে ইন্দ্রিয়জন্য vibration স্তিমিত করার সাধনা করতে হবে। তাই গীতামুখেও শ্রীকৃষ্ণভগবান বলেছেন—

> ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যাভিচারিণী।
> বিবিক্ত-দেশসেবিত্বম-রতি র্জনসংযদি॥ ইত্যাদি।

এই জন্যে মাঝে মাঝে নির্জনে অবস্থান ও সাধনা মুক্তিপথে একান্ত প্রয়োজন।

"সরল হলে সহজে ঈশ্বর লাভ হয়।"

বুদ্ধির কাজ হচ্ছে doubling, এই বুদ্ধি হয়কে নয়—নয়কে হয় করে। বেশী বুদ্ধিতে derailed হওয়ার আশঙ্কা থাকে। Philosophy begins with doubt. Religion তা নয়—এখানে বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।

এ কে বিশ্বাস করবে ?

এর উত্তরে বলতে হয় Science ও Philosophy-তে কিছুকে বিশ্বাস করে তবে এগুতে হয়, তাছাড়া religious হতে হলে একটু Pragmatic বা orthodox হয়। আমরা বিশ্বাস করে নিই যে ও হয় ! ঠাকুর বলেছেন ডোবার জল বেশি নাড়িও না। ঘোলা হয়ে যাবে। একছটাকে বুদ্ধি আমাদের।

Barnard Shaw ভাল বলেছেন—দেখ, ছুঁচের ডগায় লক্ষ লক্ষ বিদ্যুতিন নৃত্য করে বল্লে তোমরা বিশ্বাস কর কিন্তু Anglesরা আসেন, দৈববাণী হয়—এসব বিশ্বাস কর না।"

অবিশ্বাসীর সঙ্গও ভাল নয়—শাস্ত্রে এসব কথা আছে। মনটাকে সহজ সরল রাখবে। এতে যা জিনিষ পড়বে, তাই সরলভাবে ছাপ দেবে। জটিল মনে যা ছাপ পড়বে সব জটিল রেখাপাত করবে। এমনকি ভগবৎ দর্শন পর্য্যন্ত সরলভাবে হবে না—হয়তো সমস্ত মূর্তিটা দেখতে পেলে না, নয়তো ঠাকুর দর্শন দিলেও সম্পূর্ণভাবে সামনে ফিরলেন না—এরকম সব দর্শন হবে। হয়তো স্বপ্ন দেখছ ঘুমের ঘোরে, সেখানে মন অনুসারে স্বপ্ন দেখা হবে। সহজ মানুষ যে স্বপ্ন দেখবে, জটিল মানুষ সে স্বপ্ন দেখে না তার স্বপ্নেও থাকবে খানিকটা জটিলতা। এমনি কাঁচে আলো পড়ে সহজভাবে, আর আতস কাঁচে আলো পড়ে অন্যরকম ভাবে। কাজেই সহজ সরল শিশুর মত দিন কাটিয়ে দেবার চেষ্টা করা ভাল। অন্তে রামকৃষ্ণ লোক।

"তমোগুণে সংহার।"

সাধু ব্রহ্মচারীদের দিনের বেলায় ঘুমোনো উচিৎ নয়। মনুর

স্মৃতিতে আছে "মা দিবা স্বাপ্সি"। ৪ ঘণ্টার বেশী রাত্রিতে ঘুমোনো উচিৎ নয়। ঘুম মানেই তমোগুণ। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড প্রভৃতির মতে ঘুমের মধ্যে আমাদের মনের প্রহরী বা censor নিদ্রিত হয়ে পড়ে, তাই অবচেতন মন সুবিধা পায়। তমোগুণে বিনাশ আনে। কাজেই ধর্মরাজ্যে বিনাশ এনে দেবে এই ঘুম—এই আলস্য। গীতায় আছে—তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।

প্রমাদালস্য নিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতিভারত॥ ১৪।৮

"তমোগুণকে মোড় ফিরিয়ে দিলে ঈশ্বর লাভ হয়।"

ঠাকুর নিরক্ষর জ্ঞানসিন্ধু তো কত কি জানতেন। আর কথায় কথায় উপমা দিয়ে অতি গহীন তত্ত্ব, কঠিন তত্ত্ব সহজকরে বুঝিয়ে দিতেন। গীতামুখে শ্রীভগবান তমোগুণ সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন।

অপ্রকাশোহপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহএবচ
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে করুনন্দন॥
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ॥
মূঢ় গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তৎতামসমুদাহৃতম্॥

মোহ, আলস্য, প্রমাদ এসব তমোগুণের লক্ষণ। তমোগুণে বিনাশ আনে, আর পরের বিনাশার্থে যে তপস্যা—সে নিজের শরীরকে অত্যধিক কষ্ট দিয়েও—সে সব তমের লক্ষণ। মোটামুটি ভাবে তমোগুণে ধ্বংস, বিনাশ, অনিষ্ট এসবের কথা গীতামুখে বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ ভগবান। কিন্তু এখানে দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর তমোগুণের মোড় ফিরানোর কথা কত সুন্দর করে বললেন। গীতায় যে তমোগুণের অধোগতির কথা বলা হয়েছে মোড় ফেরালে বললেন ঈশ্বর লাভ হয়। ভক্তির তমঃ যার হয়, তার বিশ্বাস জ্বলন্ত।

আর গীতায় বলা আছে তমোগুণে অপরের অনিষ্ট সাধন ইত্যাদি হয়ে থাকে, উচাটন, বশীকরণ ইত্যাদি কিন্তু এখানে ঠাকুর বললেন, তমোগুণকে পরের মঙ্গলের জন্যে ব্যবহার করা যায়। তিনরকম

বৈদ্যের উপমা দিলেন—উত্তম বৈদ্য রোগীর কুশলের জন্যে বলপ্রয়োগ করেন ও ঔষধ খাওয়ান রোগীকে। এতে রোগীর মনে সাময়িক কষ্ট হলেও আখেরে রোগটি ভাল হয়ে যায়। কাজেই এক্ষেত্রে তমোগুণে লোকের কল্যাণও সাধিত হল। মা যেমন অবাধ্য সন্তানকে মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে কাজ না হলে মার ধোরও করেন কিন্তু তাতে সন্তানের কুশলই হয়ে থাকে। আর একটি কথা, এখানে বৈদ্যের আচরণ তমোগুণীর মত হলেও, উদ্দেশ্য শুভ—রোগীর আরোগ্য কামনা। কাজেই উদ্দেশ্য যখন শুভ, তখন ফলও শুভ হবে।

তমোগুণ অন্যের দুঃখজনক গীতার এই মত। কিন্তু এই দুঃখ যখন ভগবানের জন্য প্রযুক্ত হয় তখন এতে তার তামসিকতা থাকে না। ভগবৎ লাভ হয়। কত সুন্দর কথা, কত সুন্দর উপমা।

> "তিনের কৃপা হলো—একের কৃপা বিনা জীব
> ছারেখারে গেল।"

প্রথম গুরুদত্ত নাম করে যাওয়া, যেটি দিয়ে গুরু ধরা পড়েছেন। জেনে হোক, অজানায় হোক—যেমন করে হোক। একটু চালাক হ'তে হবে এবং সেই চালাকীটি দিব্য চালাকী। ফাঁকে ফাঁকে একটু নাম করে যাওয়া। বৃথা কথা বলা ছেড়ে নাম করে যাওয়া। মনের সঙ্গে একটু দিব্য চালাকী খেলতে হবে। "যোগঃ কর্মসু কৌশলম্—" শ্রীদক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর বলেছেন, তিনের কৃপা হলো—একের কৃপা বিনা জীব ছারেখারে গেল।" জীবের কৃপাই হয় না। মনকে বলবে একদিন তো যেতেই হবে, তার জন্য অন্ততঃ কিছু পরলোকের insurance এর ব্যবস্থা করে নে!

নাম করে যাও, ঠাকুরকে ডেকে যাও, পরে দেখবে কৃপা কাকে বলে। ব্যবসা করতে হলে, চাকরি করতে হ'লে কিছুদিন এমনি খাটতে হয়, তারপর লাভের কথা—শ্রীঠাকুর ব'লেছেন—নাম কর আর সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা কর যাতে ঈশ্বরেতে অনুরাগ হয়"। সবই আছে মন্ত্র আছে, দেবতা আছে, সব আছে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস নেই। ক'রতে ক'রতে তবে বিশ্বাস হয় যেমন মিছরি খেতে খেতে

তার গুণ বোঝা যায়। তেমনি গুরুমন্ত্র জপ ক'রতে ক'রতে তবে তার শক্তি বোঝা যায়।

> "মন নিয়ে কথা। মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত।
> মনকে যে রঙে ছোপাবে, সেই রঙে ছুপবে।
> যেমন ধোপা ঘরের কাপড়।"

Association এর effect মনের ওপরে খুব। এমন তত্ত্বসম্বন্ধে আমরা পাশ্চাত্য দার্শনিকের কথাতেও মিল পাই। Mill প্রভৃতি দার্শনিকদের Associationist' বলা হয়। এঁদের মতে মনে যা কিছু জ্ঞান সমস্ত বহির্বিষয়ের সঙ্গে মনের সম্বন্ধে গড়ে উঠে। এদের মতে মন যন্ত্র স্বরূপ। ঠাকুরও বলেছেন-আমি যন্ত্র স্বরূপ। ঠাকুরের কথার সঙ্গে ওদেশের দার্শনিক, মনোবিজ্ঞানী এঁদের তত্ত্বেরও কত মিল রয়েছে। যত পড়ি, অবাক হয়ে যেতে হয়। coherence of truth রয়েছে। কাজেই এর থেকে আমাদের জানার কথা হচ্ছে যে, আমাদের associationটী শুভ হওয়া চাই।

> "ঈশ্বরে মন রাখার উপায় সৎসঙ্গ, মাঝে মাঝে
> নির্জ্জন বাস ও সর্বদা ঈশ্বরের নাম গুণ।"

এই বাণীর মানে কি? মনোবিজ্ঞানে বলে by law of association মনে নানা বাসনার তরঙ্গাঘাত সৃষ্টি হয়। ভক্তির প্রথমাবস্থায় এটা ঠিক নয়, এজন্য মাঝে মাঝে সংসারের association ছেড়ে চলে যেতে হয় নির্জ্জনে যেখানে কেবল ঈশ্বর চিন্তা করার সুবিধা হয়। এই ভাবে মাঝে মাঝে যেতে যেতে ঈশ্বর চিন্তা যখন দৃঢ়ভাবে হতে থাকে তখন অত প্রয়োজন হয় না। চারাগাছ বড় হয়ে গেলে যেমন ছাগলে গোরুতে খেতে পারে না তেমনি। আর ওই যে বললেন কচ্ছপ জলে চরে বেড়ায় কিন্তু তার মন কোথায় পড়ে আছে। আড়ায় পড়ে আছে যেখানে ডিমগুলি আছে, তেমনি সংসারে কাজ করলেও ঈশ্বরে মন ফেলে রাখতে হয়। বাণীগুলি পড়ে সব কিছু কিছু সাধন অভ্যাস করার দরকার।

"মন মুখ এক করা"।

এই কথাটার দ্যোতনাটা নিতে হবে। প্রথম এই কথাটি হচ্ছে ভগবৎলাভ প্রসঙ্গের কথা। সেখানে ঠাকুরকে মন মুখ এক করে ডাকতে হবে। এদিকে লোক দেখানো মালা ঘুরালে, কিন্তু মন যদি তাতে না থাকে তো কাজ হবে না। কাজেই মন মুখ এক করা মানে কপটতা ত্যাগ করা।

কিন্তু সামাজিকভাবে অনেক সময় মৌখিক ভদ্রতার প্রয়োজন হয়। মন না চাইলেও অনেক কাজ গৃহের সুবিধার জন্য, সমাজের সুবিধার জন্য করতে হয়। আবার মুখে ভদ্রতা দেখিয়ে আড়ালে তার প্রচণ্ড ক্ষতি করে দিলে, এগুলোও ঠিক নয়। এগুলো কপট ভাব বা অনিষ্টকর ভাব। এগুলো ছাড়তে হবে।

> "ঘরের ভিতর যদি রত্ন দেখতে চাও আর নিতে চাও তা হলে পরিশ্রম করে চাবি এনে দরজার তালা খুলতে হয়। তারপর রত্ন বার করে আনতে হয়।"

রত্ন সর্বদাই একুট গোপনে থাকে। সিন্ধুকের ভেতর থাকে। সেখানে একটা জোরের দরকার। ভক্তকে জোর করে নিতে হয়। তাই ঠাকুর ভাঙার কথা বলেছেন। ঠাকুর বেশ Dynamist ছিলেন।

> "মনে অভিমান করবে, আর বলবে তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ, দেখা দিতে হবে।"

এই অভিমান বড় হয় না। জপধ্যান যাই কিছু করা যাক না কেন একটু অহঙ্কার থাকে। এ অভিমান ভক্তের অভিমান, ছেলের যেমন মায়ের ওপর অভিমান। জ্ঞানীর এ অভিমান হয় না। সগুণ হতে নির্গুণে যাওয়া আছে, আবার নির্গুণ হতে সগুণে যাওয়া আছে। আবার আছে Theoretical সগুণ থেকে Practical সগুণ আর Theoretical নির্গুণ হতে Practical নির্গুণ।

"সাধক অবস্থায় মনটা নেতি নেতি করে তাঁর দিকে দিতে হয়। সিদ্ধ অবস্থায় আলাদা কথা। তাঁকে লাভ করার পর অনুলোম বিলোম।

আধুনিক বিজ্ঞানমতে এটি static ও dynamic তত্ত্ব। এর বিভিন্ন প্রকার ভেদে বিভিন্ন প্রকাশ। যেমন Light energy, heat energy প্রভৃতি। আর তাদের গুণাদিও বিভিন্ন। Static energy যেন পরব্রহ্ম আর dynamic energy যেন আদ্যাশক্তি। আমাদের বুঝবার মত এরা।

"মন থেকে সব ত্যাগ না হ'লে ঈশ্বর লাভ হয় না।"

জাগতিক কোন জিনিষেরই বেশী গভীরে প্রবেশ করা উচিৎ নয়। সব জিনিষ দূরে থেকেই ভাল। বেশী গভীরে গেলেই গোলমালে পড়তে হয়। একটু আলগাভাবে থাকলে কোন গোলমালের ভয় থাকে না। শ্রীঠাকুরের কথা "মন একলা থাকলে ক্রমে শুষ্ক হ'য়ে যায়।" সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সর্ব্বদা শুষ্ক ক'রে রাখবে। জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্মেন্দ্রিয় দুইই। বিশেষ করে জ্ঞানেন্দ্রিয়। ধর রসগোল্লা খেলে, তারি রসে মনটা বেশ কিছুক্ষণ রসিয়ে রইল। তাই 'ভ' উদ্দীপন হয় না। ভাগবৎরস আনতে হ'লে অন্যরস ভুলে যেতে হবে, তবে 'ভ' হবে। তাই ধর্মপথে এত দেরী হয়। দেখা, শোনা খাওয়া সব বিষয়ে সব মিষ্টতাকে নষ্ট করলে তবে ভাগবৎ মিষ্টতা ঠিকভাবে পাবে। এই যে লুব্ধ হ'য়ে দেখছ—তোমার এই দেখার মিষ্টতাটুকু তখন আর থাকবে না। এবং এইভাবে মনকে অন্য মিষ্টতা থেকে সরিয়ে শুষ্ক করতে পারলে তখন ভাগবৎ মিষ্টতা আসবার যোগ্য হবে, তারপরে তাঁর কৃপাতে তঁকে ধরতে পারবে।

"তিনি শুদ্ধ মনের গোচর"।

তিনি শুদ্ধ মনের গোচর।
তাই মনকে করতে হবে শুদ্ধ।
মনের অসাম্যের কারণ—

এর তিনটি বৃত্তি........
অনুভূতি, চিন্তা, ইচ্ছা।
মনোবিজ্ঞানের মতে·······
এদের সখ্য আছে, বৈরতা আছে।
এই সূত্রে....···
ভাগবত মুখে—···
এদের আনতে হবে........
সমতায়.......শুদ্ধতায়...
সেই শুদ্ধ মনই তিনি।

পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান অনুসারে মনের তিনটি বৃত্তি—চিন্তা, ইচ্ছা, এবং অনুভূতি। এই বৃত্তি তিনটি মনের মাঝে সর্ব্বদাই একসঙ্গে অবস্থান্ করছে। এদিক দিয়ে দেখলে এদের মাঝে রয়েছে নিবিড় সখ্য। কিন্তু অপরদিকে আবার বৈরতাও আছে অর্থাৎ এরা কখনও তিনটি একসঙ্গে প্রবল থাকতে পারে না। কখন চিন্তা হয় প্রবল কখনও ইচ্ছা হয় প্রবল। কখনও বা অনুভূতি হয় প্রবল। আবার একটি বৃত্তি যদি অতি প্রবল হয়ে উঠে তখন আর দুটি হয়ে যায় ক্ষীণ। কিন্তু একেবারে মুছে কেউই যায় না। এই যে এদের মধ্যে সখ্য এবং বৈরতার খেলা চলেছে এতে আমাদের মনে আসছে অসাম্য। সাধন রাজ্যে মনকে আনতে হবে সাম্যে। তার উপায় প্রথম প্রথম আমাদের এই তিনটি বৃত্তির মধ্যে যে সখ্য আছে সেটি ভেঙে ফেলতে হবে। যেমন মনকে যে কোন একটি বৃত্তিতে স্থির রাখা। অর্থাৎ জ্ঞানী বা ভক্ত বা যোগী প্রথম প্রথম নিজের নিজের ভাব অনুসারে কেউ হয়তো ইচ্ছারূপ বৃত্তি দ্বারা মন স্থির রাখবেন এবং ঐ একটি বৃত্তি ছাড়া যাতে অন্য বৃত্তি না আসে সে বিষয়ে খুবই লক্ষ্য রাখবেন। যেমন কেউ হয়তো চিন্তারূপ বৃত্তির দ্বারা ভগবৎ চিন্তায় মনকে রেখেছেন স্থির করে—সেখানে হঠাৎ এসে দেখা দিল অনুভূতি বা ইচ্ছা।। এই সময় এই বৃত্তিগুলিকে দমিত করবার চেষ্টা করতে হবে। ক্রমে ঐ একটি বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলে তখন এদের মাঝে যে বৈরতা

আছে সেটিকেও ভেঙে ফেলতে হবে। কারণ সাম্য যেখানে, সেখানে বৈরতা সখ্য উভয়ই বর্জনীয়। তখন সেই প্রতিষ্ঠিত বৃত্তির মধ্যে অপর দুটি বৃত্তিকে যুক্ত করে দিতে হবে। যেমন জ্ঞানী যিনি শুদ্ধ চিন্তা মাত্র নিয়ে পড়েছিলেন তিনি এই বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে এনে যুক্ত করবেন অনুভূতিকে। অর্থাৎ চিন্তার বস্তুটিকে বোধ করতে চেষ্টা করবেন। তখন অনুভূতিই হয়ে যাবে চিন্তা-স্বরূপ। আবার ভক্ত যিনি কেবলমাত্র অনুভূতি নিয়ে পড়ে আছেন অর্থাৎ কেবল মাত্র ভজনাদিকেই মুখ্য বলে ধরে আছেন তিনিও এতে প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে যুক্ত করবেন চিন্তাকে, ইচ্ছাকে। তাঁর প্রবল নাম ও ভজনের সমান তালে চলবে রূপচিন্তা এবং তাতে থাকবে প্রবল ইচ্ছা। এই ভাবে এখানেও সবেরই সম্মিলন ঘটবে! এবং যোগী যিনি প্রবল ইচ্ছাশক্তি সহায়ে একটি চক্রে ধারণা নিয়ে পড়ে আছেন তিনিও তাতে প্রতিষ্ঠিত হলে সেই ধারণার মাঝে আনবেন রূপচিন্তা এবং ক্রমে তাঁকে বোধ করার চেষ্টা করে অনুভূতি বৃত্তিকে এনে সেখানে যুক্ত করবেন। এইভাবে আমরা যদি এই বৃত্তিত্রয়ের মূল স্বভাব দুটিকে ভেঙে ফেলতে পারি তা হলে আমাদের মনেও আসবে সমতা। এই সম-মনই শুদ্ধ-মন এবং শুদ্ধ মনেই তিনি প্রকাশিত হন। এই শুদ্ধমনই তাঁর স্বরূপ। "যস্মিন বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা" (মুণ্ডক ৩।১।৯)।

যদিও এই কার্য্যগুলি কতক কতক সাধারণ ভাবে সাধকের হয়তো আপনিই এসে পড়ে তবু এগুলি কেন হয় জানা প্রয়োজন এবং এইরূপে মনোবিজ্ঞানসম্মত ভাবে নিজে চেষ্টা করে করলে সাধন রাজ্যে বেশী সুফল পাওয়া যাবে।

এই মনে ব্রহ্মানুভূতি হয় কিনা? ঠাকুর বলেছেন, "তিনি শুদ্ধ মনের গোচর।" কাজেই আমরা শুদ্ধ মনের দ্বারাই ব্রহ্মানুভূতি লাভ করি। পাশ্চাত্য দার্শনিক কাণ্ট এই সসীম মনের দ্বারাই অসীমকে জানা যায় না ব'লেছেন—তবে তিনি ব'লেছেন মানুষ উভয় জগতেরই অধিবাসী—শুদ্ধ প্রজ্ঞা হিসাবে পারমার্থিক জগতে তার স্থান—

সংবেদন দেহেন্দ্রিয় নিয়ে সে অবভাসিক জগতে (Phenomenal) বাস ক'রছে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দ্বারা পারমার্থিক বস্তু জানা যায় না। তবে নৈতিক জীবনের জন্য পারমার্থিককে মানতে হবে। ঠাকুরের বাণীর সঙ্গে ইচ্ছা-ব্রহ্ম তত্ত্বের মিল দেখা যায়। (বেঃ ছঃ ৩।২৮)

ইচ্ছা-ব্রহ্ম আপনাকে বোধ-ব্রহ্মে, বিলাস-ব্রহ্মে রূপায়িত ক'রেছেন....সৃষ্টি তাই বহুবোধের বিলাস ..এই এক-বহু বোধ-ব্রহ্মকে ইচ্ছা ব্রহ্মে আনতে হবে...প্রার্থনা, নাম, ধ্যান সহায়ে, ইচ্ছা-বোধ থেকে ইচ্ছা-ব্রহ্মকে পৃথক ক'রতে হবে শুদ্ধ ইচ্ছা রূপে ...

মনোবিজ্ঞানে তিনটী তত্ত্ব—চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা। তার মধ্যে অনুভূতি বা বোধ তত্ত্বটিকে কেহ কেহ আদি তত্ত্ব বলেন। পশু মনে এটী সব চেয়ে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই বোধ-তত্ত্ব থেকে বিলাস-তত্ত্ব। নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা প্রভৃতি Instinct গুলি ঐ বিলাসের জন্য।

কিন্তু ব্রহ্মের সিসৃক্ষাই আদি তত্ত্ব। ব্রহ্মের সিসৃক্ষা থেকে সৃষ্টি। সোহকাময়ত (তৈঃ উঃ-২—৬)। তিনিই ইচ্ছা ক'রলেন সৃষ্টি বিলসিত হোক"। যখনি তাঁর ইচ্ছা জাগল তখনি তিনি নিজের সম্বন্ধে সচেতন হ'লেন। এই অহং-বোধ হলেই তখন বিলাস প্রয়োজন। তখন 'একাকী ন রমতে'। তখন বহু প্রয়োজন, অন্ততঃ দ্বিতীয় প্রয়োজন। কারণ বোধ ক'রতে হ'লে কি বোধ ক'রবে—তাই দ্বিতীয় প্রয়োজন (Relativity of feeling)। উপনিষদ্ মতে দেখা যাচ্ছে ব্রহ্মের সিসৃক্ষা বা ইচ্ছাই আদি। জীব-মনে বোধ-তত্ত্ব আদি বা বড় ব'লে মনে হ'লেও দেখা যাচ্ছে সমষ্টি-ক্ষেত্রে ইচ্ছাটাই হ'চ্ছে জয়যুক্ত। মনোবিজ্ঞানে ইচ্ছা-তত্ত্বই কার্য্যক্ষম তত্ত্ব সবচেয়ে।

তিনি বিলাস চেয়েছেন, বিলাসের ইচ্ছা করেছেন, তাই প্রতি ঘটে ঘটে তিনি বিলাসের জন্য বোধ-স্বরূপ হ'য়ে র'য়েছেন। তাই প্রত্যেকেই চাচ্ছে নিজেকে রক্ষা ইত্যাদি ক'রতে। এবং চাচ্ছে বহু

ভোগ। এগুলি তাদের সহজাত প্রবৃত্তি। এসব ব্রহ্মের সিসৃক্ষা থেকেই এসেছে।

কিন্তু প্রতি সৃষ্ট পদার্থের ভেতর তিনি একত্ব হারান নি। ঘটে ঘটে বিলাস করবার ইচ্ছাও আছে—আবার স্বরূপে একরূপে অবস্থানের ইচ্ছাও আছে। তাই ইচ্ছা ও বোধ স্বরূপে তিনি বিলাস চাচ্ছেন, আবার স্বরূপে এক হ'তে চাচ্ছেন।

এই ব্রাহ্মী সিসৃক্ষাকে আবার যদি আদিম এক ইচ্ছা-স্বরূপে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হয় তা'হলে সেই সিঁড়ি দিয়েই ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে যে সিঁড়ি বেয়ে তিনি নেমেছেন। তার জন্যে বিলাস ব্রহ্মকে নিয়ে যেতে হবে বোধ-ব্রহ্মে—বোধ-ব্রহ্মকে নিয়ে যেতে হবে ইচ্ছা-ব্রহ্মে এবং বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখতে হবে কেবল শুদ্ধ-ইচ্ছারূপে—Supreme will-এ—গুরু-উপদেশ, জপ ধ্যান সহায়ে। সমস্ত জীবনে বিরাট ইচ্ছাশক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। সেখানে বোধের বিলাসের কোন স্থানই থাকবে না।

বোধ এবং ইচ্ছা জড়িয়ে গেছে ব্রহ্ম-মনে। তাই ঘটে ঘটে চলেছে বিলাসের ইচ্ছা। এই বিলাস তত্ত্বকে ইচ্ছা থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রতে হবে। এবং ব্রহ্ম-মনে যে বোধের ইচ্ছা হ'য়ে ছিল, সেখানে প্রতিষ্ঠিত হ'লে, সেখানেও ইচ্ছা থেকে বোধকে সরিয়ে দিতে হবে। এই চেষ্টা থাকবে প্রথম থেকে, যদিও আমরা এর ধারণা এখন কিছুই ক'রতে পারব না।

প্রথমে বহুর সম্বন্ধে বিলাস এবং বোধটি গুটিয়ে আনতে হবে। তার সঙ্গে বহুর ইচ্ছাও। অর্থাৎ বহু বিষয়ে ভোগেচ্ছা। তখন থাকবে এক বোধ-ইচ্ছা। পরে এক-বোধকেও (feeling self or egoকে) সরিয়ে, কেবল শুভ ইচ্ছায় Pure will-এ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই Supra Will, Pure Will বা শুদ্ধ ইচ্ছা ইষ্ট-দর্শনে সমর্থ হন। শ্রীঠাকুর বলেছেন, তিনি শুদ্ধ মনের গোচর।

ক্যাণ্ট মনের ক্রিয়াকে তিনটী ভাগ করেছেন। ইন্দ্রিয়গণ

(Senses), বুদ্ধি, ইচ্ছা। ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি, সত্য জ্ঞানের প্রত্যক্ষ নির্দ্দেশ দিতে পারে না। কিন্তু যখনই আমরা সঙ্গত ইচ্ছা করি (will some thing) তখনই আমরা অতীন্দ্রিয় লোকের সত্য জ্ঞান পেতে পারি। শুদ্ধ ইচ্ছা (Good Will) হ'চ্ছে ন্যায় সঙ্গত ইচ্ছা (Rational Will), ইহা স্বাধীন। ইন্দ্রিয়জ ও বুদ্ধিজ জ্ঞান জাগতিক জ্ঞানের পারে যেতে পারে না। কারণ ইহারা স্বাধীন নয়। শুদ্ধ ইচ্ছার ভিতর বোধ বা অনুভূতির স্থান নাই।

সোপেনহাওয়ারের মত, জগৎটা ইচ্ছাময় (World as will) আমাদের বাঁচবার ইচ্ছা আছে।

৩। Relativity of feeling—অনুভূতিগুলি আপেক্ষিক। এরা নির্ভর করে আমাদের পূর্ব্বানুভূত অনুভূতির উপর, সংস্কারের উপর অথবা বোধের জন্য বিষয়ের উপর। মনোবিজ্ঞানে এ তত্ত্বটি আজো ঠিক বলা হয় নাই। প্রফেসর ষ্টাউট তাঁর পুস্তকে এ বিষয় সামান্য কিছু উল্লেখ করেছেন।

"শুদ্ধ মনে যা উঠবে তা তাঁরই বাণী"।

দুঃখ কষ্ট—এগুলি ভক্তরা নেবে ঠাকুরের দান ব'লে। তারা বলবে "আঘাত সে যে পরশ তব"। মানুষ যদি না আঘাত পায় তাহলে ভগবানকে ডাকবে না। ভোগের চুষিকাঠী দিয়েই তিনি ভুলিয়ে দেন এগুলি বেশী হ'লে ঠাকুরকে ভুলে যাবে। কেউ অসুখে প'ড়লে কি কিছু বিপদ হ'ল—তাই তিনি মনে করিয়ে দেন কৃপা ক'রে। নিজেরাই দেখ না দাঁত পড়ছে, হাত ভাঙছে কিনা শেষের দিন ঘনাচ্ছে। এগুলি ঠাকুরের কাছে যাওয়ার দূরাগত নির্দ্দেশ। মানুষ যদি বুঝতে পারে এটা তবে সুবিধা হয়। তাঁকে যে কেউ চাচ্ছে না। তারা চাচ্ছে দেহটি যাতে থাকে—সুখ শান্তি বজায় থাকে। তিনি 'ত' আমাদের দরজায় ব'সে আছেন কিন্তু কই লোকে কেবল 'টকি' দেখতে যাচ্ছে, একবার হৃদয় মন্দিরে 'ত' তাকিয়ে দেখে না। তিনি ত 'টকি' করে গেছেন, এই যে বৃন্দাবন লীলা আর

সবলীলা এগুলি তো ভাল 'টকি'। এগুলি 'ত' কই লোকে দেখতে চেষ্টা করে না। ঠাকুরের দিকে আমাদের দৃষ্টি নেই তা থাকলে দুঃখও আনন্দ। আসল কথা নাম করে যাও আর পবিত্র হও। তাহলে কষ্ট পেলেও বুঝতে পারবে। তিনিই পবিত্র হৃদয়ে ছায়া ফেলবেন যে এইজন্য কষ্ট দিচ্ছি। শুদ্ধ মনে যা উঠবে তা তাঁরই বাণী।

দেহের শুদ্ধির দরকার, মনের শুদ্ধির দরকার। দেহের দ্বারা যা গ্রহণ করবে তাও বিশুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। আর মনের শুদ্ধি আচার্য্য শংকর 'ত' বলেছেন, মনের দ্বারা যা গ্রহণ করবে তা যেন শুদ্ধ হয়! দেহের মনের পারে যে বুদ্ধি অহংকার সেগুলিরও অশুদ্ধতা দূর করতে হবে। যেমন বুদ্ধিকে যদি সাধারণ ভাবে ধরি যা দ্বারা আমরা নানারকম আলোচনা করি সে আলোচনাও আমরা অপবিত্র আলোচনা ক'রব না। তার পারে যে অহংকার তাকেও আমাদের শুদ্ধ করতে হবে। আমাদের অহং সত্ত্বা যেন সর্ব্বভাবে শুভ বিষয় নিয়ে থাকে। তাই শ্বেতাশ্বতরে ঋষিদের প্রার্থনা। "স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু"

"সাধন করে এগিয়ে পড়"।

কথামৃত মুখে ওই যে ঠাকুর বললেন, 'এগিয়ে পড়'। এটি খুব সুন্দর কথা। জীবনে উন্নতি করতে গেলে তমোগুণী হলে চলবে না—জাগতিক জীবনেই বল আর আধ্যাত্মিক জীবনেই বল, গীতোক্ত সত্ত্বগুণীর মত 'ধৃত্যুৎসাহ-সমন্বিত' হতে হবে। এগোবার চেষ্টা রাখতে হবে সর্ব্বদা।

আমার সব হয়ে গেছে, আমার আর শেখার কিছু নাই, এই ভাবলে আর কোনদিন উন্নতি হবে না। সঙ্গীতে বল, খেলায় বল, পড়ায়, ব্যবসায়, নূতন নূতন আবিষ্কার প্রচেষ্টা, সর্ব্বত্র উন্নতি লাভ করতে গেলে চাই এগিয়ে যাবার চেষ্টা। অহংবশতঃ আমার সব হয়ে গেছে বলে বসে থাকলে চলবে না। আর ধর্মরাজ্যে তো বটেই একটু দর্শন হল, কি উদ্দীপন হল, অমনি যদি ভাবো আর কি

আমার সব হয়ে গেছে তাহলে আর এগোনো হল না। নিরন্তর হরিময় হয়ে যাবার চেষ্টা রাখতে হবে, প্রার্থনা করতে হবে। এই এগিয়ে যাবার কথা কথামৃত মুখে যেমন পাই, তেমনি উপনিষদ মুখে ঋষিদের বাণীতে পাই।

'এগিয়ে পড়' কথায় কাঠুরিয়ার কথা প্রসঙ্গে ওই যে চন্দন কাঠের বনের সন্ধান, ওটা হচ্ছে প্রবর্ত্তক, তারপর রূপোর খনির কথা, ওটা হচ্ছে সাধক, তারপর সোনার খনি হচ্ছে সিদ্ধের কথা, আর ঐ হীরের খনির কথা, ওটা হচ্ছে সিদ্ধের সিদ্ধর কথা—এগুলি মনে রেখে চলবার চেষ্টা করা দরকার। যত আমরা এগিয়ে যাব তত আমাদের অহং কমে যাবে, ঘুম, ক্রোধ, লোভ এই সব কমে যাবে। ভগবৎ তত্ত্বের কাছে যত যাব, ততই অহংতত্ত্ব কমে যাবে। তখন দীন হীন শরণাগত হয়ে যাব। মাথা নীচু হয়ে যাবে। এটা অবশ্য ভক্তের। আবার জ্ঞানীদের প্রথম দিকে মাথা উচু থাকে, অহং থাকে। কিন্তু পরে অহং তত্ত্বের সমবসে প্রতিষ্ঠা। একেবারে যাঁরা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন তাঁদের অহং আকাশের মত উঁচু হতে পারে। আবার ধূলিও হতে পারে। সবই একই হয়ে যায় কিনা। ত্রৈলঙ্গস্বামী এই আকাশমুখী ব'সে আছেন, কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। আবার যে যা অত্যাচার করতে চায় করে যাচ্ছে। 'এগিয়ে পড় শ্রীঠাকুরের এই বাণী জ্ঞানের উন্নতি পর্বে বিরাট সম্ভাবনা নিয়ে আছে। ভোগের পথে এই বাণী আমাদের অভ্যুদয়ের পৈঠা। আবার যারা ত্যাগপন্থী তাদেরও এই বাণী একস্থানে স্থিতির বিরোধী। যারা ভোগৈকপ্রসক্ত পথে এগিয়ে পড়ে তারাও কখন শ্রীঠাকুরের বলা সেই রজ সত্ত্বের শক্তিতে ধর্মের পথে এগিয়ে পড়তে পারে। ধর্মের পরিভাষা দিতে গিয়ে জৈমিনি বলেছেন, যতো অভ্যুদয়ঃ নিঃশ্রেয়সঃ লাভ এর একটি অর্থ জাগতিক অভ্যুদয় লাভ করতে করতে আমাদের পারমার্থিক উন্নতি ঘটতে পারে। জড়স্থ হওয়া কোন পর্ব্বেই উচিত নয়। বেদেও 'চরৈবেতি' ঋকে এই কথাই বলা হয়েছে।

শ্রীঠাকুরের বাণীর সঙ্গে প্রসার ব্রহ্মতত্ত্বের বেশ মিল দেখা যায়।
(বেঃ ছঃ ৩।৩২-৩৬)

পশুদের সিদ্ধি বর্ত্তমানকে নিয়ে ....
মানবের সিদ্ধি বর্ত্তমানকে অতিক্রম করে........ . .
অতি মানবের দৃষ্টি অতি প্রসারিত·········
ব্রহ্মজ্ঞের দৃষ্টি-সিদ্ধিভূমাতে···অসীমাতে . ....
তাই প্রসারতা ব্রহ্মজ্ঞানের সহায়।

বিবর্ত্তনবাদে (Evolution theory) দেখা যায় পশু স্তর থেকে মানুষের উদ্ভব দূর-দর্শিতার ফলে। পশুরা বর্ত্তমানের Instinct বা ক্ষুধা তৃষ্ণাদি নিয়ে পরিতৃপ্ত। কালকের চিন্তা তাদের নাই। অনেকে (Mc Dougall প্রভৃতি) অবশ্য আমাদের সমস্ত কর্ম্মের পিছনে Instinct বা সহজাত প্রবৃত্তি দেখেন। কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তি মাত্র সম্বল হলে আমাদের বর্ত্তমান উন্নত অবস্থা সম্ভব হ'ত না। আমাদের সহজাত প্রবৃত্তিগুলি বুদ্ধি ও প্রজ্ঞাতে পরিণত হ'চ্ছে। যার ফলে মানবের মনে দেবত্বের উদ্ভব।

আমাদের বুদ্ধির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আমরা ভবিষ্যৎ চিন্তা করতে শিখেছি। তার ফলে আমাদের এই সামাজিক উন্নতি। যতই আমরা উন্নতি করি ততই আমাদের দৃষ্টি দুই দিকেই প্রসারিত হয়। অতীত ও ভবিষ্যৎ বহুদূর দেখতে আমাদের চেষ্টা জাগে। এইভাবে মানব যত উন্নত হয়, তার দৃষ্টি প্রসারিত হয়! কাজেই অতিমানবের দৃষ্টি ভূমাতে স্থাপিত। সমস্ত সীমাকে সে অতিক্রম ক'রতে চায়। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে জ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান তা অসীমে প্রসারিত। 'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্ম এব ভবতি'। তাই আমরা যদি অতি মানবতা লাভ ক'রতে চাই তাহলে আমাদের দৃষ্টি ক্রমশঃ প্রসারিত ক'রতে হবে। স্তরে স্তরে উঠে মন প্রতিষ্ঠিত হ'লে, 'ভূমৈব ব্রহ্ম' বুঝতে পারলে আমরা আমাদের সব বন্ধন বিমুক্ত হ'য়ে ব্রহ্মজ্ঞ হব, ভগবৎ প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রব। কাজেই চলার পথে নিত্য প্রসারশীলতা অভ্যাস ক'রতে হবে। মন যেন দিন দিন প্রসারতার দিকে অগ্রসর হয়। ঋগ্বেদে

একটি বিখ্যাত ঋক্ 'চরৈবেতি—' এই প্রসারতার গুণগানে প্রবৃত্ত। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে 'যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং তন্মর্ত্যং'। ভূমার উপদেশ উপনিষদে এক অপরূপ অধ্যায়। আর শ্রীঠাকুরের কথা—এগিয়ে পড়……।

> **"আমরা যত কাশীর দিকে এগিয়ে যাবো ততই
> ক'লকাতা পেছনে পড়ে থাকবে।"**

আগে পাপ যায়? না আগে ধর্ম লাভ হয়? দুটা পরস্পরাপেক্ষিক। এর মধ্যেএকটি অদ্ভুত রহস্য আছে, আমরা বুঝতে পারি না। আমাদের চিৎকন সত্ত্বা, জীবভূত সনাতন যত এগিয়ে যাবে—তাঁর চিৎঘন সত্ত্বা তত এগিয়ে আসবেন আমাদের দিকে। যত এগিয়ে যাবে তত পাপ মুক্ত হবে। কিন্তু কখন যে পাপ একেবারে সরে যাবে আর ঠাকুর কৃপা ক'রে দয়া ক'রে প্রকাশিত হবেন তা বলা যায় না, সেটা অচিন্ত্য। শ্রীঠাকুরের কথা. আমরা যত কাশীর দিকে এগিয়ে যাবো ততই কলকাতা পেছনে পড়ে থাকবে।'

'যে যত ঈশ্বরের দিকে যাবে, তার তত বালকের মত স্বভাব হবে।'

এটি কিন্তু সাধনার জিনিষ, যত এগোবে তত বালক স্বভাব আপনিই হবে। শুধু বালক স্বভাব দেখালেই হয় না। দুধও খাব, তামুকও খাব—এ করলে চলবে না। বালকের মত খাঁটি সরল হওয়া চাই। (বীরভূমে তামাক বলে না—নিম্নশ্রেণীর লোকেরা বলে তামুক)

ঈশ্বরের দিকে এগোলে বিষয়বুদ্ধি কমতে থাকে—বিষয় তৃষ্ণা যেন তামাকের নেশা। ঈশ্বরের দিকে এগোতে গেলে তো সব নেশা ছাড়তে হবে—আর এগোনোর লক্ষণই হল, আপনিই সব নেশাছুটে যাবে। আঁট কমে যাবে, তখন শুধুই তৃপ্তি অর্থাৎ ঈশ্বরেই তৃপ্তি।

"বাবলা গাছ দেখে ভক্তের ভাব হল, যে এতে রাধাকান্তের বাগানের কোদালের বাঁট হয়।"

সব কিছু ইষ্ট-দৃষ্টি-ভঙ্গীতে দেখতে হয়। কথামৃতে যেমন আছে **বাবলা গাছ দেখে ভক্তটীর ভাব হল; যে এতে রাধাকান্তের বাগানের**

কোদালের বাঁট হয়। তেমনি একটা ফুল দেখলে, অমনি মনে করলে এতে বেশ পূজা হতে পারে। একটা কিছু খাবার জিনিষ দেখলে, মনে করবে ঠাকুরের ভোগ হতে পারে।

যা কিছু করতে হয় কৃষ্ণার্পণম্ করে করতে হয়। ইষ্টার্পণম্ ক'রে করলে ভয় থাকে না—হেলা করেই হোক বা শ্রদ্ধাভরেই হোক-তিনি ত জানেন আমরা ঠিক পারিনা আমরা তাঁর অক্ষম ছেলে। গীতায় ভগবান শিখিয়ে দিয়েছেন 'তৎ কুরুস্ব মদর্পণম্।'

সব কিছু ইষ্ট দৃষ্টিতে দেখার সাধনার কথা আমরা পাই **"দৃষ্টি-সৃষ্টি সাধন"** সূত্রে (বে. ছ. ৫।২৭)

"দৃষ্টি সৃষ্টিসাধন"

ব্রহ্ম দৃষ্টিতে অখণ্ড সৃষ্টি—
খণ্ডের দৃষ্টিতে খণ্ড সৃষ্টি—
খণ্ড অখণ্ড অভেদ···

তাই খণ্ডের দৃষ্টিতে অখণ্ডকে, ইষ্টকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়।

বেদান্তের দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদে ব্রহ্মের দৃষ্টিতে সমস্ত সৃষ্টি। আমরা খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৃষ্টির ব্যবস্থা করি। এই দৃষ্টিকে ভূমাতে প্রতিষ্ঠিত করলে সেখানে ভূমা বা ইষ্ট প্রতিষ্ঠিত হবেন। তখন সমস্তই ইষ্ট হয়ে যাবেন।

"মন্দির দেখলে তাঁকেই মনে পড়ে, উদ্দীপন হয়। যেখানে তাঁর কথা হয়, সেইখানে তাঁর আবির্ভাব হয়।"

এতে Subjective side ও Objective side দুটি দিক আছে। প্রথম বললেন, তাঁকে মনে পড়ে Memory theory of association আর subjective side এ আবির্ভাব হয়।

ন্যায় logicএ একে trains of inference বলে। এটি সাধন রহস্য হিসাবে লওয়া হয়।

"(ভক্তদিগকে)—আমি তাদের মা আনন্দময়ী দেখব। তারা চৈতন্যদেব সেজেছে, তাহলেই বা, সোলার আতা দেখলে সত্যকার আতার উদ্দীপন হয়।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের কত রকমই জানা ছিল। কই সাধারণ গ্রামবাসী একজন এত subtle কথা বলুক দেখি। অথচ ঠাকুর যে সব কথা বলে গেছেন, এত গভীর অর্থপূর্ণ কথা – বেশ মনোবিজ্ঞান সম্মত এই কথা। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানে law of association এর তিনটি রূপ বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে এটী law of similarityর মধ্যে পড়ে। ভগবৎ স্মৃতি মনে আনবার জন্যে এ একটা পন্থা।

মানুষ কোন অতীতের ঘটনা বা কথা বা নাম যদি ভুলে যায়, তখন সেই বস্তু বা নাম বা ঘটনার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে এমন কিছু দেখলেই বা শুনলেই তখন ভুলে যাওয়া ঘটনাটী মনে করতে পারে। তেমনি সাধারণতঃ ভক্ত হয়তো ভগবান ভুলে রইল। কিন্তু যেই সেই সাদৃশ্যমূলক কিছু দেখল অমনি তার ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়ে থাকে। থিয়েটারে গৌরাঙ্গকে দেখে আসল গৌরাঙ্গমহাপ্রভুর উদ্দীপন হতে পারে। ঠাকুরের কথা না হয়তো বাদই দাও। দিলেও সত্যিকারের ভক্তের চট করেই উদ্দীপন হয়। এগুলো হচ্ছে সাদৃশ্য মূলক বা similarity-র মধ্যে পড়ে। এজন্য ভগবৎ উদ্দীপন হয়, ইষ্টের উদ্দীপন হয় এমন সঙ্গ করতে হয়। আর এই সব কারণেই ভক্তসঙ্গ সাধুসঙ্গ করতে হয়।

"টাকা মাটী, মাটি টাকা"।

শ্রীশ্রী ঠাকুরের এই সাধনা, 'টাকা মাটী, মাটী টাকা' এর পেছনে গীতায় সমত্ব বুদ্ধি আনার সাধনাটিও আছে—'সমলোষ্ট্রাশ্ম কাঞ্চনঃ', গীতার বাণী। টাকা আর মাটীতে অভেদ জ্ঞান অর্থাৎ বাসনা-বিহীনতা, কামনাবিহীনতা ও অভেদ জ্ঞানের সাধনাটিও রয়েছে। আবার এই বাণীটির অন্য অর্থ আছে। আজ জগৎ জুড়ে theory of value বা axiology (মূল্যায়ণ তত্ত্ব) নিয়ে খুব আলোচনা চলছে—এই বাণীটির মধ্যে সেই তত্ত্বটি নিহিত রয়েছে। 'টাকা মাটী মাটী টাকা' কথাটি খুব ঠিক। টাকা দিয়ে মাটী অর্থাৎ জমি কেনা যায় আবার মাটী অর্থাৎ জমি থেকেই চাষ করে ধান, গম, আলু ইত্যাদি অসংখ্য রকম ফসল, ফল, ফুল উৎপাদন করে টাকাকড়ি,

সুখ-সুবিধা ইত্যাদি অনেক কিছু পাওয়া যায়, কাজেই valueর (মূল্য) দিক দিয়ে মাটীরও value আছে। আবার টাকার value তো আছেই, কাজেই valueর দিক দিয়ে দুই-ই সমান।

Eeonomics-এ বলে money has exchange value only, কিন্তু মাটীর বুক থেকে কত কি পাওয়া যায়, সে কি বলে শেষ করা যায়? এই যে বড় বড় industry গুলো, যেখানে চলছে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকার লেন-দেন, তার মূলে কিন্তু মাল-মসলা সবই পাওয়া যাচ্ছে বা জোগাড় হচ্ছে মাটীর বুক থেকে। নানারকম ধাতু বল, কয়লা বল, পেট্রোল, লবণ, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ, সোণা, রূপা, হীরে, তূলা, পাট, রেশম ইত্যাদি বহুরকম বস্তু যা কিছু পাওয়া যাচ্ছে সব বেশীর ভাগই মাটীর বুক থেকে। মানুষের বা জীবজন্তুর সব্জী জাতীয় আহার বা আমিষ জাতীয় আহার সব আমরা পাচ্ছি মাটির বুক থেকে, কাজেই মাটী বা ধরিত্রীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে যত সব কারবার, কলকারখানা, ল্যাবরেটরী ইত্যাদি যা কিছু, আবার এসব কিছু তৈরী করতে গেলেও চাই টাকা বা অর্থ'। সেজন্য 'টাকা মাটী, মাটী টাকা' বাণীটি খুবই অর্থপূর্ণ।

টাকা 'মা'টী—অর্থাৎ মা যেমন সন্তানকে স্নেহ মমতায়, আদর যত্নে, শিক্ষায় জ্ঞানে, মানুষ করে তোলে টাকার সদ্ব্যবহারে বা টাকার সাহায্যে, সেই রকম মানুষ সৎ শিক্ষা, জ্ঞান, আহার, বাসস্থান ইত্যাদি সব কিছুই লাভ করে, কাজেই টাকা যেন মা-টী অর্থাৎ লক্ষ্মীটি। কিন্তু এর আরও একটি অর্থ আছে —অত্যধিক টাকা মানুষকে বৃথা ভোগ বিলাসিতা, অত্যাচার, আবিলতা এসবের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়, দাম্ভিক করে তোলে, এক কথায় মাটি করে দেয় বা নষ্ট করে দেয়। এতো তোমরা প্রতিনিয়ত দেখছ টাকার সদ্ব্যবহার আর কটা লোকে করছে? 'টাকা মাটী, মাটী টাকা' বলে গঙ্গায় বিসর্জন দিলেন, মানেই ত্যাগ করলেন। ত্যাগ করা মানে আর কিছু নয় একটা shock দিলেন তার ফলে পরববর্তীকালে রামকৃষ্ণ মিশনগুলিতে, রামকৃষ্ণ মঠগুলিতে

টাকা, জমি, বাড়ী ইত্যাদি হুড় হুড় করে আসছে, টাকারূপী লক্ষ্মীকে গঙ্গায় বিসর্জন দিলেন আবার প্রার্থনা করলেন, দেখিস মা যেন খ্যাঁট বন্ধ করিস নী ! অর্থাৎ দুমুঠো পেটভরা আহার যেন দিস, লক্ষ্মীছাড়া করিস না। এখন ঠাকুর তো নারায়ণ—মা লক্ষ্মী যাবেন কোথায় নারায়ণের চরণ ছেড়ে, তাই শতগুণে সহস্রগুণে ঠাকুরের নামের জগৎ জোড়া সব মিশন গুলিতে, সেবা কেন্দ্রগুলিতে আবির্ভূতা হচ্ছেন, ঐশ্বর্য্য ঢেলে দিচ্ছেন।

বিজ্ঞানের একটি তত্ত্ব হচ্ছে—each action has an equal and opposite reaction সেই নিয়মানুসারে বলা যায় নারায়ণের কাছে অর্থরূপী মালক্ষ্মী ধাক্কা খেয়ে ঐশ্বর্য্য উজাড় করে ঢেলে দিলেন বা দিচ্ছেন রামকৃষ্ণ নামাঙ্কিত প্রতিষ্ঠান গুলিতে।

এখানে আরো একটা কথা মনে হয়—আবার দেখতে হবে কি প্রসঙ্গে এই কথা বলেছেন। ঠাকুরের প্রতিটি উক্তির পেছনে ছিল সাধনা। অর্থলালসার এই যুগে অবতার পুরুষ ছাড়া কে দাঁড়াতে পারেন। ঠাকুরের কথার গভীর দ্যোতনা আছে। ঠাকুর জানতেন ভাবী রামকৃষ্ণ সংঘ বিপুল অর্থের অধিকারী হবে—সেই অর্থ যাতে সংব্যয় ও ভগবৎ সেবায় ব্যয়িত হয় তার জন্য ঠাকুরের এই সাধনা। ঠাকুর বলেছেন টাকা দিয়ে কি হয় ? কি হওয়া উচিৎ ? যা হচ্ছে তাতে তিনি ব্যথিত। অর্থ সর্ব্বস্বতার তিনি বিরোধী। Economics ও Ethics এক জায়গায় এসে মিশেছে তারপর divergent পথে এগিয়ে গেছে।

“ভাগবত, ভক্ত, ভগবান তিনে এক, একে তিন”।

ভক্তের দেহ-মন ইষ্টময়—অহরহঃ অন্তরে হচ্ছে ইষ্ট স্মরণ, ইষ্ট মন্ত্র জপ চলছে আর ঠাকুরইতো বলেছেন—নাম-নামী অভেদ, কাজেই ভক্তের দেহ মনে সর্ব্বত্র ভগবান ওতপ্রোত হয়ে থাকেন।

ভগবানের স্মরণ সর্ব্বদা করে দেহমন ভগবৎ-ময় হয়ে যায় আর ভাগবৎ বহন করছে সেই ভগবান ও ভক্তের লীলা—কাজেই ভাগবতের মধ্যেও সেই ভগবান। এককে ছেড়ে আর এককে ভাবা কঠিন। ভাগবৎ ভক্ত ভগবান এগুলি যেন correlative terms, পরস্পর সম্বন্ধসাপেক্ষ। 'ভগবান' যেই আমরা বলব তখনই মনে আসবে কার ভগবান'—তখনই বলতে হবে 'ভক্তের ভগবান' আর ভক্ত ছাড়া ভগবানের অস্তিত্ব বুঝবেই বা কে, লীলারস আস্বাদনই বা করবে কে ? কাজেই ভগবান হচ্ছেন সবসময় ভক্তের ভগবান, আর ভগবান এবং ভক্তের যে লীলা, তাই ভাগবৎ। তাই এই তিনেই মিলে এক। আর একে তিন বললেন, এরও গভীর দ্যোতনা—ভগবানের মধ্যেই রয়েছে ভক্ত আর লীলা অর্থাৎ ভাগবৎ। আবার এদিকে ভক্তের মধ্যেও আছেন ভগবান এবং ভাগবৎ এক হয়ে, আবার ভাগবতের মধ্যেও ভগবান ও ভক্ত দুই-ই রয়েছেন, কাজেই এক। আবার ঠাকুর বলেছেন, বেলের শাঁস, বীচি ও খোলা একসঙ্গে ওজন করলে পুরো ওজনটা পাওয়া যায়। তেমনি ভাগবৎ ও ভক্ত না থাকলে ভগবানের বিশ্বাস ও চলে না। ভগবানের মূল্যও যেন যায় কমে। ভক্ত না থাকলে ভগবানকে ডাকবে কে ? প্রচার করবে কে ? যদিও জানছি ভগবানই স্বয়ং সম্পূর্ণ, তাহলেও লীলা মাধুর্য্যের পরিপূর্ত্তির জন্য প্রয়োজন ভক্তের, আর ভক্ত—ভগবানের বিলাস-লীলা নিয়েই রচিত হয় ভাগবৎ। ঠাকুর অবশ্যই বলেছেন, বিজ্ঞানী দেখে যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই ভগবান, যিনিই গুণাতীত, তিনিই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান। এই জীব, জগৎ, মন, বুদ্ধি, ভক্তি, বৈরাগ্য, জ্ঞান এসব তাঁর ঐশ্বর্য্য।

যে বাবুর ঘর দ্বার নাই, হয়তো বিকিয়ে গেল, সে বাবু কিসের বাবু। ঈশ্বর ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ। কাজেই ভক্ত হচ্ছে ভগবানের বিশেষ ঐশ্বর্য্য। ভাগবৎ ও ভক্ত না থাকলে বা না মানলে ভাগবৎ তত্ত্বের মূল্য যে কম হয়ে যায়। Axiology বা theory of value নিয়ে সমস্ত বিশ্বে এখন সৃষ্টি হয়েছে বিশেষ আলোড়ন—সেই Axiologyর

দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করলে ভক্তকে বাদ দিলে ভগবানের value যাবে কমে। তারপর দেখা যায়, ভক্তের সঙ্গ করতে করতে ভক্তি হয় by law of association, আর ভক্তি শ্রদ্ধা হলে তখন ভগবানের দিকে এগোতে ইচ্ছা হয়।

আবার ভাগবৎ পাঠ, ভাগবতের সঙ্গ, ভাগবৎ পূজা এ সব করতে করতে ভগবানের দিকে এগোনো যায়। ভগবানের দিকে জোর বাড়ে! ভাগবৎ বলতে I mean গীতা, উপনিষদ, চৈতন্যচরিতামৃত, চণ্ডী, শ্রীকৃষ্ণভাগবৎ সবকটীকেই। কথামৃতও। ভাগবৎ ভক্ত ভগবানের কথা আছে ওতে। ভগবানের বাণী—এখন নিত্য নিত্য ভাগবৎপাঠ, পূজা ও ভগবানের সঙ্গ করতে করতে ভগবানের নির্দেশ পাওয়া যায়। জীবনেব বহু সমস্যাপূর্ণ মুহূর্ত্তে ভাগবতের নির্দেশ এনে দেয় চলার পথের দিশা—জীবনে আনে ভরসা, আনে শান্তি। আমার জীবনে তো এটী বহু পরীক্ষিত সত্য। একটা সত্য ঘটনা বলি। দিলীপ বাবুর সঙ্গে একজন retired military general এর দেখা হয় জার্মান ও ইংরেজ যুদ্ধের পর। দিলীপবাবু তাঁর ভ্রমন কাহিনীতে লিখছেন—সেই military general এর কাছে glass case এর মধ্যে ভাগবৎ গীতা বাঁধানো ও সযত্নে রাখা রয়েছে দেখেন। দেখে তো দিলীপ বাবু খুব অবাক হয়ে যান, প্রশ্ন করেন—একি, এ বই তুমি কোথায় পেলে? কথা সব ইংরেজিতে হয়। তাতে সেই Retired general বলেন—This has saved my life repeatedly অর্থাৎ ইংরাজ—জার্ম্মান যুদ্ধে ইংরাজরা যখন খুব ভীষণভাবে হেরে যাচ্ছে জার্ম্মাণদের কাছে, তখন ওই মিলিটারী general পালিয়ে আসছেন কোন রকমে—কাঁটা তার দিয়ে খুব strongly ঘেরা থাকে Military area গুলো তো—তো ওই অফিসারটী যখন পালিয়ে আসছেন হামাগুড়ি দিয়ে, কোথাও কোথাও বা বুকে হেটে—মন ভীষণভাবে ভেঙ্গে যাচ্ছে, ভাবছেন এইবার surrender করি, না—হয়তো মনে হচ্ছে—এই বুঝি বা ধরা পড়লাম। তখনই গীতা বইটী খোলেন আর দেখেন 'ক্লৈব্যং মাস্ম

গমঃ'—কখন ও বা 'যুধ্যস্ব বিগত জ্বরঃ'। এই সব বাণী দেখেন আর মনে প্রচণ্ড ভরসা আসে সাহস বাড়ে, তখন নূতন উৎসাহে এগিয়ে পড়েন। যাই হোক, তিনি নিরাপদ জায়গায় পৌঁছান। ওই গীতার মন্ত্র শক্তিতে প্রাণে রক্ষা পান আর যুদ্ধও করেন। তারপর অবশ্য ইংরাজরাই তো জয়লাভ করল। তা তিনি সেই যুদ্ধের পর ওই গীতাটীকে সোনার জল দিয়ে লিখিয়ে বাঁধিয়ে glass case এ রাখেন, নিত্য পূজা সুরু করেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে এক্ষেত্রে গীতাখানি তাঁকে উৎসাহ দিয়ে রক্ষা করল। ঠিক ঠিক শ্রদ্ধাশীল হলে বহু সঙ্কটপূর্ণ অবস্থায় নির্দেশ দিয়ে রক্ষা করেন। আর সাধন রাজ্যের রহস্য তো ভাগবতে থাকেই। নিত্য দিনে চলার পথে ভাগবৎপাঠ, ভাগবতের সঙ্গ, পূজা এগুলি খুবই প্রয়োজন। আর নিত্য পাঠের ফলে কত বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়!

কর্ত্তা (পিতৃদেব) নিত্য চণ্ডীপাঠ করে কাজে বেরোতেন। কত কতবার মৃত্যু মুখ থেকে রক্ষা পেয়েছেন। কানের পাশ দিয়ে গুলি পেরিয়ে গেছে, সাতটা খুন করা লোককেও তো ধরতে হয়েছে, আর পুলিশের লাইনে চাকুরী, কত বিপদের সামনে পড়তে হয়। তো ওই নিত্য চণ্ডীপাঠ ও পূজা করে রক্ষা পেয়ে যেতেন। চণ্ডী পাঠে মাচণ্ডীর কৃপা হয়, মা রক্ষা করেন। তবে সাধুরা গীতা, কথামৃত, উপনিষদ এসব বেশী করে পড়বে, আর চণ্ডীপাঠ গৃহীদের পক্ষে বেশী প্রয়োজন।

এই কথাটার—(ভাগবত—ভক্ত-ভগবান তিনে এক, একে তিন) আসল দ্যোতনাটী আমাদের নিতে হবে। ভগবানকে পেতে গেলে ভক্ত ও ভাগবৎ গ্রন্থ সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। আর যে ভক্ত ও ভাগবৎ নিত্য বহন করে চলেছে ভগবানের কথা, তাঁদের সঙ্গ ও করতে হবে। ভক্তের সঙ্গ করলে হরিকথা হয় আর ভগবানে মন যায়। আর ভাগবৎ পাঠে মনের উন্নতি হয়, ভক্তি হয়। নিত্য ভাগবৎ পাঠ আর ভক্ত সঙ্গ করলে ভগবানের দিকে এগিয়ে যেতে পারা যায়।

"যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা, যিনিই সাকার তিনিই নিরাকার"।

এই যে 'যিনি,' 'তিনি'—এগুলি ঠাকুর কেন বলতেন? এই কথাগুলি প্রথমতঃ শঙ্কর বেদান্তকে ছাড়িয়ে গেছে। আচার্য্য শঙ্কর লীলা মানেন নি, ঠাকুর লীলা মানলেন। আবার একথা হেগেলীয় দর্শনকেও ছাড়িয়ে গেছে। হেগেলের দর্শনে অদ্বৈত তত্ত্বের মধ্যে সত্তা অসত্তার দ্বন্দ্ব মানা হয়েছে, কিন্তু ঠাকুরের 'তিনি' তত্ত্বের নাই কোন দ্বন্দ্ব বা বিদ্বেষ। উপরন্তু বললেন, 'সেখানে সব শেয়ালের এক রা'—ঠাকুরের ওই 'তিনি' কথাটি খুব ছোট হলেও ওটার মধ্যে লুকিয়ে আছে গভীর তত্ত্ব। এটির সঙ্গে গীতার পুরুষোত্তম তত্ত্বের আছে মিল। এই তিনি তত্ত্বের মাঝে আছে অসীম ভাব ও রূপ। 'যিনি' 'তিনি' এই যে সর্ব্বনাম, এটি অপরিবর্ত্তনীয় পদ। এতে পুরুষোত্তমকেও বোঝাতে পারে আবার তাঁর শক্তিকেও বোঝাতে পারে। ঠাকুর সেই ভগবৎসত্ত্বাকে বেশীর ভাগ সময়ে কোন নাম দিলেন না, কারণ তাঁর যে অনন্ত নাম, অনন্তরূপ, কাজেই কোন ধর্ম বা জাতির বিদ্বেষের কারণ হতে পারে না। এই 'তিনি' সত্ত্বাটি জাতি ধর্ম নির্ব্বিশেষে সকলেরই উপাস্য।

যোগীর পরমাত্মা, তন্ত্রের শিব, বেদান্তের ব্রহ্ম, গীতার পুরুষোত্তম, খৃষ্টানদের যীশু, অগ্নি উপাসক, জিহোবাদের আহুরমাজদা ইত্যাদি আরও কতকি, সবই 'তিনি' সর্ব্বনাম শব্দে অভিহিত হয়েছেন বা হতে পারেন।

আর 'যাঁর,' 'তাঁর,' 'যিনি,' 'তিনি,' কথার মধ্যে আছে আর একটি দ্যোতনা, যেটি হচ্ছে ঠাকুর এক বিরাট ব্যক্তিত্ব মেনেছেন বা একজন Person কে মেনেছেন—যেমন, গীতার পুরুষোত্তম। সগুণ, নিগু'ণ সবই তার বিভাব। এখন Personকে মানার এক বিরাট সুবিধা, এঁর কাছে কেঁদে বিপদের সময় ডাকা চলে, বুকটা হাল্কা করা চলে—ইনি বিরাট ব্যক্তিত্বযুক্ত বলে ভক্তের আকুতিতে গলে প্রার্থনা শোনেন, ধরা দেন, কৃপা করেন।

কিন্তু শুধু যদি ভাবসত্ত্বা হয়, কি শুধু যদি energy হয়, কি

নিগু´ণ ব্রহ্ম হয়, তাঁর তো ওই করুণা, দয়া এ সবের কোন অর্থই হয় না।

সাধে কি শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত আজ জগতের বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে—আর সবার মন জয় করেছে। ঠাকুর যে সবার ঠাকুর, সবার মত করে বলেছেন বলেই তো এত mass appealing হয়েছে।

"জড়ের সত্ত্বা চৈতন্যে লয়, চৈতন্যের সত্ত্বা জড়ে লয়।"

জড় বলতে কিছু নেই, সবই চৈতন্যের প্রকাশ। তবে কেবল degreeর তফাৎ। কারো ভিতর চৈতন্যের degree বেশী সে হল মানুষ, কারো ভিতর আরো কম—সে হল জীব জন্তু, কারো ভিতর আরো কম—যেমন গাছপালা। আবার জড় বস্তু বলে আমরা যাকে মনে করি, ইট, কাঠ, মাটী, পাথর এতেও চৈতন্য সত্ত্বা বিদ্যমান, তবে প্রকাশ খুব কম। আর গীতামতে জড়ের প্রকাশ বলতে কিছুই বলেন নি—তাঁর প্রকৃতি এই সৃষ্টির মধ্যে বিলাস করে সব সৃষ্টি করছে—দুটীই চেতন প্রকৃতি,—চৈতন্য সত্ত্বা থেকে অচৈতন্য সৃষ্টি কি করে হবে? তবে degreeর তফাৎ এত কম যে, কোনটা জড়বৎ প্রতীয়মান হচ্ছে। আসলে কিন্তু জড় বলতে কিছু নাই। আর বর্ত্তমানে higher physicsএও বলছে সবই mindর খেলা matter বলতে কিছু নাই। আমরা সব সময় বুঝতে পারি না। বোঝবার সূক্ষ্মতা আমাদের নাই। ঠাকুর বললেন—জড়ের সত্ত্বা চৈতন্যে লয়, আবার চৈতন্যের সত্ত্বা জড়ে লয়। যেমন এই যে গাছটী রয়েছে, এই গাছটী নিত্যি নিত্যি দেখতে দেখতে মনে এমন একটী ছাপ পড়ে যায় যে, এই গাছটীকে যদি কেটে দেওয়া যায় তো আমাদের মনে খুব কষ্ট হয়। এটা ওই ওদের প্রভাব, ওদের সত্ত্বা আমাদের মনের ওপর react করে বলে হচ্ছে। যেখানকার প্রকৃতি যেমন হয়, সেখানকার মানুষের স্বভাবও সেই রকম হয় এর মানে কি? ওই ওদের প্রভাব মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করে। এতো বহু প্রমাণিত সত্য। একদিনকার একটা ঘটনা বলি—এখানে

আমার ঘরের নীচে একটী মাধবী ফুলের গাছ ছিল—সেটী যখন আমাকে না বলে কেটে দেওয়া হয়, তখন আমি ধ্যান করছিলাম, তো হঠাৎ দেখি এক ঝলক মাধবী ফুলের সুগন্ধ অথচ তখন ওই ফুলের সময় নয়, কিন্তু ওই গাছটী সুগন্ধ ছড়িয়ে আমাকে জানিয়ে দিলে ওর বিদায় ব্যথা। এতো ওই ঠাকুরেরই বাণীর ব্যাখ্যা। অবশ্য সকলের বোঝার এই সূক্ষ্ম বোধ নাই। আবার সাধু মহাপুরুষদের চৈতন্য সত্ত্বার প্রভাব বেশী, সেজন্যে তাঁদের ব্যবহার্য্য জিনিষে তাঁদের সত্ত্বা বেশ খানিকটা বিধৃত থাকে, এতো ওই চৈতন্যের সত্ত্বা জড়ে লয়, এরই ব্যাখ্যা। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর মাকে জাগালেন, সে তো ঐ একই কথা। বড় বড় theory দিয়ে বোঝানো যায়। একটী সহজ উপমা দিয়ে বুঝিয়ে বলি—আয় সুনীল, তুই-ই প্রথম আয়—নে, স্কুলের ছেলেদের ব্যবহৃত এই পেন্সিলটী নে, এদিয়ে একটা কবিতা লেখ তো—সুনীলের কবিতা লেখার একটু ক্ষমতা আছে—*সে আমার নির্দ্দেশে একটী কবিতা সেই পেন্সিল দিয়ে লিখল—*

গঙ্গার কুলুকুলু তানে
ভাসায়ে তরী আমি চলেছি
উজান বেয়ে পরমতীর্থের পানে
যেথায় পরমেশ্বর আছে বসি স্বরূপে।

আচ্ছা, এবার আমার বহুদিনের ব্যবহৃত এই কলমটী দিয়ে আবার একটী কবিতা লেখ—

মনের গহনে ছিল যে ব্যথা
বলিনি তোমারে প্রিয়
যুগ যুগান্তের সঞ্চিত-কথা
সে তো তোমারই বলা বেদ গাথা।

দুটী কবিতা পড়ে দেখ, একটা সাধারণ ছেলের ব্যবহৃত পেন্সিলের লেখা কবিতা, আর একটা আমার কলমে লেখা—ওই কলমের মধ্যে আমার সত্ত্বা, আমার পবিত্রতা, আমার কাব্যশক্তি বিধৃত হয়ে আছে। সেজন্যে দেখলে আমার কলমে লেখা কবিতাটী কত সুন্দর হয়েছে।

আচ্ছা রামজী, তুমি এস, দেখি নাও, ছেলেদের ব্যবহৃত এই পেন্সিলটী নাও, একটা কবিতা লেখ।

কবিতা লেখার একেবারেই অভ্যাস নাই রামজীর। আমার আজ্ঞায় ধরলে পেন্সিল—

মায়ের পায়ে আছে পড়ে শিব
কিন্তু কেন যায় না অভাব
রাখতে হবে তোমার চির-স্বভাব
তখন দেখতে পাবে ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ।

আছা রামজী ঃ—এবার আমার কলম নাও—লেখ আবার।

সুরধুনীর কুলে কেতুমি ভবতারিণী।
কবেহবে আমার চির আদরিণী॥

দেখ, এবার কোন্‌টা ভাল হয়েছে। কবিতা, ভাব-এই সব রকমে। এখন বুঝলে—জড়ের সত্ত্বা চৈতন্যেলয়, আর চৈতন্যের সত্ত্বা জড়ে লয় কথাটা ?

"আত্মা যদি থাকেন তো অনাত্মাও আছেন"।

আমরা বেদান্তমতে পাই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্, সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। এখন আত্মা ও ব্রহ্ম একই এবং সর্ব্বব্যাপী। কিন্তু ঠাকুরের বাণীর মধ্যে আমরা পাই নতুনত্বের আভাষ। আশ্চর্য্য কথা আত্মা যদি আছেন, অনাত্মাও আছেন। অনন্ত ভাবময় ঠাকুরেরই বলা সাজে এই কথা, সংশয় জাগে মনে, তাহলে অনন্তই তো খণ্ডিত হয়ে যায়—অনন্ত কখনও বহু হতে পারে না কিন্তু ঠাকুরের সূক্ষ্মদৃষ্টি পথে ঠিক তত্ত্বই প্রকাশিত হয়েছে। যারা নাস্তিক তাদের কাছেও ভগবৎবস্তু বা তত্ত্বের প্রকাশ আছে ; অবশ্য অন্যভাবে। নাস্তিকদের কাছে তাই ভাবগ্রাহী জনার্দন প্রকাশিত হন অনাত্মাভাবে, কারণ তাঁর ভাবরূপ কিছুরই ইতি করা যায় না—কাজেই তিনি নাস্তিকদের কাছে অনাত্মারূপে প্রকাশিত। তাঁরই আর একটী বাণী "তিনি আরও কত কি ? তাঁর ইতি করিস না।" এখন অনাত্মা কেন বললেন ? যারা

নাস্তিক, তাদের মন শুধুমাত্র খাওয়াপরা, ভোগ বিলাসিতায় মত্ত হয়ে এত স্থূলত্ব বা জড়ত্ব প্রাপ্ত হয় যে তারা চেতন আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন ধারণাই করতে পারে না, সেজন্য নাস্তিকদের কাছে তিনি অনাত্মা বা জড়। পাশ্চাত্য দর্শনে জড়বাদীগণ যেমন বলেন, মন হচ্ছে জড়ের খেলা, মন বলতে চেতন কিছু বস্তু নাই। এও ঠিক তেমনি। আসলে ভগবান তো ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন, যে যেভাবে ভজনা করে তিনি তাকে তেমনভাবে কৃপা করেন।

'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম' একথা তিনি নিজে গীতামুখে বলেছেন। তবে যার যেমন চশমার Lense বা যার যেমন দৃষ্টিভঙ্গী সে ভগবৎ বস্তু সম্বন্ধে সেই রকম ধারণাই তো করবে। কাজেই শুধু খাওয়া পরা, ভোগ বিলাসিতা ইত্যাদি gross বা স্থূল বিষয় নিয়ে যারা থাকে তাদের ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা অনাত্মা ভাবে। তাই ঠাকুরের এই বাণী যথেষ্ট অর্থপূর্ণ।

> "বেলের সার বলতে গেলে শাঁসই বুঝায়। তখন বীচি আর খোলা ফেলে দিতে হয়। কিন্তু বেলটা কত ওজনে ছিল বলতে গেলে শুধু শাঁস ওজন করলে হবে না। ওজনের সময় শাঁস, বীচি, খোলা সব নিতে হবে।"

ঠাকুরের এই যে কথা, এর মধ্যে গভীর তত্ত্ব লুকিয়ে রয়েছে। শ্রীরামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের (ব্রহ্ম জীব-জগৎবিশিষ্ট) প্রতিষ্টা ঠাকুর এখানে করলেন। তাছাড়া বর্তমান পাশ্চাত্যদর্শনে Theory of Value একটী বিশেষ স্থান গ্রহণ করেছে। এখানে ওই Value Theory ব্যাখ্যাত হয়েছে। Value Theory অনুসারে ওজনে কম হলে Value কম হয়ে যাবে—সৃষ্টি আর ব্রহ্ম বেলেতে বীচি, শাঁস ও খোলা। বীচি ও খোলা বাদগেলে যেমন বেলের ওজন কমে যায় তেমনি সৃষ্টিকেও বাদদিলে ওজনে কম হয়ে যায়। ওজন কমে গেলে Value ও কমে যায়। কাজেই ওজন কমলে চলবে না। এখন

এই Value কার আছে—কার দৃষ্টিভঙ্গীতে-না ভক্তের কাছে, ভক্তের দৃষ্টিভঙ্গীতে—কাজেই Standard of Value অনুসারে ওজন প্রথম এবং প্রধান লক্ষের মধ্যে থাকবে। ভক্তের কাছে ভগবানের Value কমে যাবে যদি সৃষ্টিতত্ত্ব বাদ দাও কেননা তাহলে ওজনে কম পড়বে। আর ওজনে কমেগেলে Value ও কমে যাবে তখন কেউ আর ঠাকুরকে চাইবে না। জ্ঞানী যেমন ভগবানকে চায় না।

মণিরত্নের কত কত যে গভীর তত্ত্ব লুকিয়ে রয়েছে-- কথামৃত সমুদ্রের গভীরে যত সন্ধান করবে যত ডুবদেবে তত অন্তর রাজ্য সোনায় সোনা হয়ে যাবে।

"যার অটল আছে তার টলও আছে"।

truth হ'চ্ছে এমন জিনিষ, যার সঙ্গে কখনও, কোন কালে, কারো কোন সংঘর্ষ হয় না। সর্ব্বকালে সর্ব্বস্থানে সত্য অবাধ থাকে। যা সত্য তার সঙ্গে কিছুর বিরোধ হয় না। আমাদের বুঝবার ভুল। দেখনা শঙ্কর প্রমুখ দার্শনিকেরা বলেছেন ব্রহ্ম অচল, অটল, সুমেরুবৎ। তাঁদের মতে সবকিছুর পেছনে আছে, অচঞ্চলতা, অপরিবর্ত্তন। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে বৌদ্ধগণ, হোয়াইট হেড প্রভৃতি ব'লেছেন চঞ্চলতাই প্রধান জিনিষ। সব কিছুর পেছনে আছে— চঞ্চলতা, পরিবর্ত্তন। আমরা ভাবি, বুঝি শঙ্করের মত খণ্ডিত হ'ল! ওটা আমাদের বুঝবার ভুল। ওর মধ্যে আছে মিল। শ্রীঠাকুর ব'লেছেন "যার অটল আছে তার টলও আছে।" সেই অচিন্ত্য অসীম সত্বার এক এক দিকমাত্রই প্রকাশিত হ'য়েছে, হ'চ্ছে বা হবে।

অমাদের মন গতিশীল, সেই জন্যে ব্রহ্মের ওপর পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম এই সব চিন্তা করে। বার্গশর ইলান ভাইট্যাল নিত্য "ইমার্জ" ক'রে চলেছেন, এটাও আমাদের মন গতিশীল ব'লে এসেছে। আমাদের মন স্থির থাকতে পারে না ব'লে আমরা এই রকম চিন্তা করি কিন্তু আমাদের মন যখন স্থির হয়ে যাবে তখন তিনিও আমাদের কাছে অচল অটল সুমেরুবৎ চির স্থির হয়ে যাবেন।

> **"এখানে যারা আসবে তাদের শেষ জন্ম। আবার বলেছেন, 'এখানে যারা এসেছে তাদের এইটুকু জানলেই হবে যে প্রথম আমি কে ? আর তারপর তারা কে ?"**

ঠাকুর এর মধ্যে ঠিক কি যে বলতে চেয়েছেন সেটি আমি ঠিক বলতে পারব না। ঠাকুর অনেক সময় অনেক গুহ্যকথা গুহ্যতত্ত্ব বলতেন তো, তবে আমার মনে হয় ভক্তেরা হচ্ছেন ঠাকুরের কলমী লতার দল। যুগে যুগে যেমন ভাবে প্রয়োজন হয়েছে সেইভাবে সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে এসেছেন। শ্রীচৈতন্য অবতারে ঠিক যেমনটি দরকার তেমনটি নিয়ে এসেছিলেন, আবার দক্ষিণেশ্বর লীলায় ঠিক যেমন দরকার তেমনি নিয়ে এসেছিলেন। স্বামীজিকে না আনতেন যদি তাহলে কি যে হতো বলা যায় না। সাঙ্গোপাঙ্গদের আনার প্রয়োজন আছে, কারণ তা না হলে ঠিক লীলাবিলাস চলে না। আবার মহাপ্রভুর সঙ্গের পার্ষদেরাই তো মহাপ্রভুকে জগতে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, প্রচার করেছিলেন মহাপ্রভুর ideal, mission সবকিছু।

জহরলালের যারা right hand সেইসব কংগ্রেস কর্মীরাই তো নেহরুর কথা প্রচার করবে। কাজেই তাদের কথা মানতে হবে।

ঠাকুর স্বামিজীর স্বরূপটি স্পর্শ করে পরীক্ষা করে দেখে নিলেন, মানেই জগৎকে দেখিয়ে দিলেন তাঁর আসল স্বরূপটাকি ? এমনি ভাবে ঠাকুর ভক্তদের পরীক্ষা করে দেখে নিলেন তাঁদের আসল স্বরূপ কি ? স্বামীজিরা যতক্ষণ না বুঝতে পেরেছিলেন তারা কে, কি জন্য এসেছেন ততক্ষণ একটু ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছেন। স্বামিজী গাড়ুর জল এগিয়ে দিতে গেলে ঠাকুর নিতেন না। জানতেন তাঁর সঙ্গে কি সম্বন্ধ। আবার রাখাল মহারাজকে পান খেতে দিতে বললেন, তখন মহারাজ বললেন পারব না। এতে আপাততঃ আমাদের মনেহতে পারে এটি অন্যায়, কিন্তু ঠাকুর তাতে বিরক্ত হলেন না। রাখাল রাজা, পান না সাজলেও ক্ষতি নাই। আর একটা কথা মনে হয়, ঠাকুর স্বয়ং ঠাকুর, স্বয়ং ভগবান, নররূপী নারায়ণ

জীবের দুঃখ দূর করতে মানুষ দেহে নেমে এসেছেন। পার্ষদেরা এটি যদি বুঝতে পারেন তাঁরাও ঠাকুরের একান্ত আপনজন, ঠাকুরের লীলা সহচররূপে নেমে এসেছেন বিলাসের জন্য ও প্রচার কাজের সহায়ক হতে, এসব জানতে পারলে আর কোন গোল থাকে না। তাছাড়া পার্যদরা ছাড়াও সাধারণ ভক্ত যারা ঠাকুরের সময়ে যাতায়াত করত বা এখনও যারা ঠাকুরেব স্মরণ নিয়েছে, ঠাকুরের ধামে যাচ্ছে তারা যদি ঠাকুরকে জীবের উদ্ধার কর্ত্তা, স্বয়ং নারায়ণ বলে বুঝতে পারে ও নিজেদেরকে অতি অকিঞ্চিৎকর ভেবে আকুল হয়ে শরণ নিতে পারে তো তাতেই তাদের মুক্তি হয়ে যাবে।

- **"কথামৃত মুখে চিঠির গল্প রয়েছে। চিঠিটী হারিয়ে গিয়েছিল, শেষে অনেক খোঁজার পর চিঠিটী পাওয়া গেল। পড়ে দেখে—পাঁচ সের সন্দেশ ও একখানি রেল পাড় কাপড় পাঠাবার কথা লেখা আছে।"**

চিঠিটা শাস্ত্র; হারিয়ে গিয়েছিল শাস্ত্রের মর্মার্থ। ফিরে পাওয়া অর্থাৎ উদ্ধার হল। এইটী গুরু মুখে জেনে নেওয়া।

দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর বলেছেন—শাস্ত্রে বালি, চিনি মিশেল আছে, সেজন্য শাস্ত্রের সার গুরু মুখে শুনে নিতে হয়।

ঠাকুর হচ্ছেন সন্দেশ আর কাপড় অর্থাৎ বস্তু; এটী লাভ হলে তো কথাই নাই তার জন্যে চেষ্টা, শাস্ত্রপাঠ, সাধনা, সবই প্রয়োজন তারপর গুরু রয়েছেন। অবতার মহাপুরুষদের কথাগুলি কেমন ছোট ছোট, কিন্তু সেই ছোট খাটো কথাগুলির মধ্যে কি গভীর তত্ত্বকথা নিহিত। ভগবান ঈশামুশীও ছোট্ ছোট্ Parables কত সহজ করে বলতেন অথচ তার মধ্যে আছে সার কথা।

"দেহ যেন সরা, মন রূপ জল, তাতে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব পড়ে।"

এতে জড় চৈতন্যের একটা সম্বন্ধ পাওয়া যায়, সরার মাটিতে জল আছে। তবে দুটি একনয়। দেহ মন চৈতন্যের আধার। দেহমনের

প্রয়োজন এইজন্যে—চৈতন্য প্রতিফলিত হবার জন্য। দেহ ও মন সেই হিসাবে পৃথক হলেও যুক্ত ভাবে আছে।

কিন্তু লাইবনিজ প্রভৃতির মতে দেহ মনের মধ্যে কোন বাইরের যোগ সম্বন্ধ পাওয়া যায় না। এঁরা দেহ মনে, ভগবানের দেওয়া সামঞ্জস্য বাদী (প্রিএস্‌টাবলিস্‌ড হারমনি)। আবার ডেকার্টে প্রভৃতি মনস্বীরা দেহমনের মধ্যে চিরপার্থক্য স্বীকার করেন। স্কোলাষ্টিক দার্শনিকরা মনে করতেন, এদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু শ্রীঠাকুর যেভাবে তাঁর দেহ মনের সম্বন্ধটি দিলেন সেটি সকল মতের পরিপোষকও বটে আবার তাদের ছাড়িয়েও গেছে। এক চৈতন্য সর্বত্র থাকায় সবই মূলত এক আবার এই উদাহরণের মধ্যে সাংখ্যের চিচ্ছায়া আছে, বেদান্তের সচ্চিদানন্দ আছে।

পাশ্চাত্য মতে এটি ইন্টারএকসানিজম [interactionism]। প্রফেসর বুসে (Prof Busse's) এর মতবাদও এই প্রকার। এর মতে চৈতন্য আধারই দেহ ও মন। দেহের পুষ্টির সঙ্গে মনের পুষ্টির যোগ আছে। দেহ ও মন যুক্ত সত্বা। [এনসাইক্লোপিডিয়া অফ রিলিজিয়ন এণ্ড এথিকস্‌ পৃঃ ৭৭৮] পাশ্চাত্ত্যে বিভিন্ন মতের মধ্যে এই মতই বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে।

"চৈতন্যবায়ু যেমনে নিয়ে যাবে"।

পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানে বলছে দেহ এবং মন দুটো পাশাপাশি চলে। দেহের কিছু হলে মন পালটে যায় এবং মনের কিছু হলে দেহ পালটে যায়। আমার কিন্তু মনে হচ্ছে এক আত্মা এই দুটি হয়েছেন, দেহ এবং মন। কাজেই তিনি যখন যেমন থাকেন দেহমন ঠিক তেমনি হয়ে যায়। যেমন শরীরের একটা অংশ নড়লে অপর অংশগুলিও নড়বে। তেমনি আত্মা যদি কাদাতে ডুবতে যায় তবে দেহমন তেমনি মলিন হয়ে যাবে। আর আত্মা যদি জ্যোতির দিকে যায় তবে দেহমনও জ্যোতি স্বরূপ হয়ে যাবে।

> **"ওদেশে হালদার পুকুর দেখেছিলাম পানায় ঢাকা। যেখানেই পানা একটু সরে গেছে সেখানেই পরিষ্কার জল।"**

জ্ঞানস্বরূপ আত্মা তেমনি অজ্ঞান পানায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছেন, যেখানেই আবরণ সরে যায় সেখানেই স্বয়ং স্বরূপে তিনি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন। কতো সহজ উপমায় কতো গভীর বেদান্ত জ্ঞানের কথা বলে দিলেন। আর উপমাটি এতো সুন্দর যে সকলেরই মনে গভীর রেখাপাত করে—বোধগম্য হয় অতি দুরূহ তত্ত্ব। শঙ্কর বেদান্তে মায়ার তত্ত্ব বর্ণনায় বলা হয়েছে, মায়ার দুটি শক্তি—আবরণী ও বিক্ষেপনী। মায়ার এই দুটি শক্তিই জীবের ব্রহ্ম জ্ঞান লাভের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। এখানে ঠাকুর ওই যে পানার উদাহরণ দিলেন—পানার মধ্যে মায়ার ওই দুই শক্তিরই প্রকাশ রয়েছে, আর সচ্চিদানন্দ যেন জল।

পানা ঢাকা পুকুরের জল যেমন সাময়িক ভাবে দেখা যায়, তেমনি মানুষের মনে সাময়িকভাবে ভগবৎ শক্তি জাগে, কিন্তু আবার পরক্ষণেই বিষয় চিন্তা ঢেকে ফেলে। পানা ঢাকা পুকুরের মত মায়ার আবরণে, পাপের আবরণে। চারিপাশের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া, ছেলেমেয়ে, পরিবার এরাই তো মায়ার আবরণ—এরাই তো কুমন্ত্রণা দিয়ে মানুষের মনকে দেয় বিগড়ে।

> **"আবার আছে, ব্রহ্ম অবাঙমনসোগোচর। জ্ঞান সূর্যের তাপে সাকার বরফ গলে যায়। ব্রহ্মজ্ঞানের পর, নির্বিকল্প সমাধির পর, আবার সেই অনন্ত, বাক্যমনের অতীত, অরূপ, নিরাকার ব্রহ্ম"।**

নির্ব্বিকল্প সমাধি কি? সান্ত অনন্ত, ওসব কিছুই বলা যায় না—সেখানে মনটী যায় হারিয়ে, যে মন দিয়ে আমি দেখছি, জানছি, সেই মনের অহংটি সাময়িক ভাবে হারিয়ে যায়। কাজেই জানাবে কে? কিছুই বলা যায় না, কেবল অস্তিমাত্র উপলব্ধব্য।

> **"যখন জগৎ নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয়, তখন মা সৃষ্টির বীজ সকল কুড়িয়ে রাখেন। গিন্নীর কাছে যেমন একটা ন্যাতা কাতার হাড়ি থাকে, আর সেই হাঁড়িতে পাঁচরকম জিনিষ তুলে রাখে।"**

ঠাকুরের শ্রীমুখের কথা, "ব্রহ্মশক্তি অভেদ।" তা না হলে যে সৃষ্টি দাঁড়াতে পারে না—কারণ ব্রহ্মের সিসৃক্ষা বলতে যা বুঝি তা শক্তির কাজ। কারণ ব্রহ্ম নির্গুণ, তাঁর ভিতর ইচ্ছা বা সৃষ্টির বীজ অর্থাৎ শক্তি ভিন্ন ইচ্ছাই বা দাঁড়াতে পারে কিরূপে? কে ইচ্ছা করে? কাজেই সগুণ ব্রহ্ম এবং নির্গুণ ব্রহ্ম এক না হলে সব মিথ্যা হয়ে যায়।

> **"ঋষিরা ও জ্ঞানীরা ভয় তরাসে। বিজ্ঞানী পাকা খেলোয়ারের মত।"**

ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরের লীলায় একরাত্রে গিরিশ, দানাকালী ও আর একজন মত্ত অবস্থায় দক্ষিণেশ্বরে আসে—এক বিপর্য্যস্ত অবস্থায়—এসেদেখে ঠাকুর ওদের চেয়েও মত্ত—পরনের কাপড় পর্যন্ত খসে পড়েছে-মদমত্ত গিরিশদের নামমত্ত ঠাকুর অবশিষ্ট রাতটুকু নাচিয়ে নেন। অথচ ওরূপ অবস্থায় মহাপ্রভুর কাছে আসা যেত না, নিয়ম ছিল। রাজা প্রতাপরুদ্র খালিগায়ে গড়াগড়ি দিচ্ছেন গম্ভীরায়। ঠাকুরের কাছে কে না এসেছে? কিনা করেছে? একদিন স্বামিজী তার এক জ্ঞাতিভাইকে (চারুদত্তকে) নিয়ে ঠাকুরের কাছে আসেন। ঠাকুরের তখন ক্যানসার। ঠাকুর বল্লেন যত আদাড়ে লোককে নিয়ে আসবি—তাদের জ্ঞান দিতে দিতে আমার চোখ ধোঁয়ায় যায় যায়। ঐ গেজেল চারু দত্তকে ঠাকুর একবার স্পর্শ করেন। ঐ স্পর্শে দত্ত কাঠ হয়ে যায়। স্বামিজী ভয় পেয়ে গেলেন—পরের ছেলেকে আনলাম—সে সমাধির কিছু জানে না। হঠাৎ সেই অবস্থা হলে brain rupture হবে। তিনি একছিলিম গাঁজা সেজে বল্লেন—দাদা খাবে? দত্ত ত কথাই বলতে পারে না—ইঙ্গিতে বল্ল 'না'। দিব্যানন্দ যে পেয়েছে সে কি আর এসব নিয়ে মাত্‌তে

পারে? তোমরা যারা অনেকদিন এই পথে রয়েছো তাদের হৈ চৈ গোলমাল ভাল লাগে না—মত্তলোকদের কাছে এলে কষ্ট হয়। এই দিব্যানন্দের রেশ ভেঙে ভেঙে যায়। যদি একবার তা পরিপাক হয় তবে আর এসব ভাল লাগে না।

"ব্রহ্ম জ্ঞানীরা এত মহিমা কীর্ত্তন করে কেন।"

কেন এ হয়? জগৎটা তাঁর ঐশ্বর্য। মানুষ ঐশ্বর্য ভালবাসে। ঐশ্বর্য্য তার মায়া, স্থূল, তাই স্থূল মন তাই চায়, তিনি ঈশ্বরানন্দ দেন নাই বলে। সৃষ্টি তাঁর মায়া। এই মায়া আমাদের ভুলিয়ে দেয়। মায়ার শক্তি সাময়িকভাবে ব্রহ্ম হতেও শক্তিমান। ভোগান্ত না হলে বাগান বা জগৎ ভালবাসে। বাগান সাময়িক ভাবে আমাদের পূর্ণতা দেয়, তাই বাগানই ভাল লাগে।

"জ্ঞান কাঁটা দিয়ে অজ্ঞান কাঁটা তোলা।"

মনকে যত কমপ্লেক্স বা জটিল করা যায় তত বাঁধুনি দেওয়া হয়। সরলমনে ভগবান লাভ হয় একথা ঠিকই কিন্তু আমাদের মনে ত জটিলতা এমনিই আছে; সহজে এ জটিলতা কাটেও না। কাজেই একে আরও জটিল করে ঠাকুরকে বাধবার দড়ি তৈরী করতে হয়। জটিলতার দ্বারাই জটিলতা নষ্ট হয়। যেমন শ্রীঠাকুরের কথা, জ্ঞান কাঁটা দিয়ে অজ্ঞান কাঁটা তোলা।

'এও কর্ম যোগ'

ভগবৎ লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত দিব্য কাজ হয় না, তার আগে বাসনা কামনার কাজ। ভগবৎ লাভের পর তখন ভগবৎ কাজ, তাঁর কাজ তাঁরি প্রেরণা। তার আগে, মানুষ তবে কি করবে? তখন গুরু নির্দেশ। ঠাকুরের বলা আছে, এও কর্ম যোগ। আর আছে তাঁর নাম চিন্তা করে, প্রার্থনা করে কাজ করে যাওয়া।

গুরুর আদেশে কাজ করাই তপস্যা। প্রথম গুহায় বসে কি জপ ধ্যান করতে পারা যায় তাই কাজ ও জপ ধ্যান দুই চাই। তৈরী হলে তবে শ্রীঠাকুরই কাজ কমিয়ে দেন। ঠাকুরের কাজ যা করছ

উত্তম তপস্যা। ঠাকুরের মনে যদি একবার হয় যে ছেলেটা আমার জন্য খেটে খেটে গেল তাহলে তোমার চৌদ্দজনম ধন্য হবে।

ঠাকুরই শ্রেয় এবং ঠাকুরই প্রেয় হোক, এই চেষ্টা কর—প্রার্থনা কর। শ্রেয় আর প্রেয়ের মাঝে যে দ্বন্দ্ব আমরা নিত্য অনুভব করি সেটি তাহলে মিটে যাবে।

> **"কর্ম করতে গেলে একটি বিশ্বাস চাই, সেই সঙ্গে সঙ্গে জিনিসটি মনে করে আনন্দ হয়।"**

এই কথাটি মনোবিজ্ঞান সম্মত। উইল, (will) বিলিফের (belief) মধ্যে একটি পারস্পরিকতা আছে। [টু ফোল্ড রিলেশন্] আর আনন্দ হওয়াটাও মনোবৈজ্ঞানিকের দ্বারা সম্মত। আরো বলেছেন বিশ্বাস যত বাড়বে জ্ঞান তত বাড়বে। এও মনোবিজ্ঞান সম্মত কথা, সমস্ত জ্ঞানের পিছনে একটা বিশ্বাস প্রয়োজন। মনোবিজ্ঞানে জ্ঞান বলতে বুঝায় কতকগুলি চিন্তাধারা, সত্য বস্তুর সঙ্গে এদের সম্বন্ধ, আর এই সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস।

> **"হাত ভাঙ্গা.......অহঙ্কার নাশের জন্য......নির্ম্মূল হবার জন্য।"**

ঠাকুরের এই যে অহঙ্কারের কথা, এ অহঙ্কার হচ্ছে বিরাট অহং-এর কথা, ভূমার অহং-এর কথা। সাধারণ মানুষের যে অবিদ্যার অহং, ঠাকুরের অহং সে অহং নয়। ঠাকুরের মনতো তখন ওপরে উঠেই থাকত......নীচে নামতই না—তাই ঠাকুরের মন নীচের দিকে অর্থাৎ লীলা বিলাসের রাজ্যে নামাবার জন্য, এই হাতভাঙ্গার ব্যবস্থা—এখন মনটাকে সর্ব্বদা ওপরের দিকে বা নিত্যে ওঠানো চলবে না। এখন ভক্তি ও ভক্ত ভগবান নিয়ে থাকতে হবে।

> **"খানদানী চাষা" হাজার অনাবৃষ্টি হলেও, চাষ আবাদ ছাড়ে না।**
> **রাগানুরাগা ভক্তি.........বৈধীভক্তি।**

প্রথম প্রথম সবই ভাল লাগে; কিছুদিন যাওয়ার পর দেখবে

‘সর্ব্বং ভয়ান্বিতং খলু’। কিন্তু আমাদের ‘খানদানী চাষা’ হতে হবে। খানদানী চাষা হাজার অনাবৃষ্টি হলেও চাষ আবাদ ছাড়ে না।

রাগানুরাগা ভক্তি যেন ঐ খানদানী চাষার মত। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি কোন কিছুতেই খানদানী চাষা যেমন দ’মে যায় না, চাষ করার প্রীতি বা প্রয়োজনীয়তায় চাষ করে চলে, তেমনি রাগানুরাগা ভক্তিতে ভক্ত ভগবানকে না ডেকে থাকতে পারে না। যেন নিবিড় যোগাযোগ সাধিত হয়। বৈধী ভক্তি সাময়িক। কিন্তু একবার রাগানুরাগা ভক্তি লাভ হ’লে আর যাবার নয়। রাগানুরাগা ভক্তি লাভ করতে গেলে ভগবানকেও কৃপা করে দর্শন দিতে হ’বে। যেমন ধর, পূজা করতে বসেছ, তখন যদি কৃপা করে একবার দর্শন দেন তাহলে আর চিটে গুড়ের পানা কিনা বিষয় বাসনা ভাল লাগবে না। কিন্তু সেটি দেন না বলেই যত গোলমাল।

“গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব”।

দক্ষিণেশ্বরে চাঁদনীর ঘাটে শ্রীশ্রীঠাকুর ব্রহ্মানন্দ কেশবকে বলেছিলেন, তোমরা বলো “গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব”। কেশব বলতে পারেন নি। তিনি বলেছিলেন, এখন অত দূর নয়। সত্যি এই ছোট্ট মিষ্টি কথায় কত বড় তত্ত্ব যে লুকান আছে তা বলা যায় না। ত্রিতত্ত্ব ইংরাজীতে যাকে বলে “Trinity” ভাগবৎ-ভক্ত-ভগবান অর্থাৎ Creation—Divinity—God। ভক্ত—Creation। সারা বিশ্বে এ ছাড়া আর কি আছে? বিশ্ববাসী মাত্রেই ভক্ত আর আছেন ভগবান—আর তাঁর কথা-শাস্ত্র-ভাগবৎ। সেই মত ‘গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব’ একই প্রকারের ভাবের দ্যোতক। তবে বৈষ্ণব শাস্ত্রে গুরুকে বড় করেছেন। বলেছেন গুরু না হলে কৃষ্ণ পাবার উপায় নেই। এ খুব সত্য কথা। এই যে গভীর তত্ত্ব কথাগুলি ছোট্ট করে বলা, এ বলতে পারত্তেন বুদ্ধদেব, যীশুখৃষ্ট আর আমাদের ঠাকুর।

“যত মত তত পথ”।

আমার একটা কথা মনে হচ্ছে—ধর্মের সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের একটা নিবিড় সম্বন্ধ বা যোগাযোগ আছে। তাই যখন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে

থাকে না বিশেষ স্থূলত্ব, তখন ধর্মও হয়ে ওঠে সূক্ষ্ম—উদার। বৈদিক যুগে সমাজে ছিল না কোন জটিলতা—ছিল না কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সঙ্কীর্ণতা তাই সিন্ধু শতদ্রুর উদার অভ্যুদয়ের মধ্যে ঋষিদের ধর্ম হয়ে উঠেছিল উদার ও সূক্ষ্ম। সেই উদার উন্মুক্ত নির্মল আকাশের নীচে নিরন্তর ধ্যান করার ফলেই ঋষিদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল ভূমার সুর —'ভূমৈব সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি'। ধ্বনিত হয়েছিল বেদান্তের সার্ব্বভৌম মতবাদ 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, জীবব্রহ্মৈব নাঽপরো।' এযুগেও মানুষের মধ্যে বিরাটের আভাস জেগে আছে ঠিকই, কিন্তু তা বড় স্থূল। এযুগ বস্তুতান্ত্রিক যুগ—মানুষের মন আজ বড় স্থূল কিন্তু এই সমস্ত স্থূলত্বকে ছাড়িয়েও ঠাকুর দেখালেন, মহতো মহীয়ান এক উদার আলোয় ভরা পথ 'যত মত তত পথ', সব ধর্মই সত্য।

বর্ত্তমান যুগ স্থূল বস্তুতান্ত্রিক যুগ হলেও বিজ্ঞানের যুগ। বর্তমানের মানুষ যুক্তিবাদের মানুষ বিনা বিচারে মেনে নেওয়া প্রগতিশীল মন সায় দেয় না। তাই দেখা যায়, শ্রীঠাকুর প্রচলিত ধর্মমতগুলি নিচ্ছেন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টি ভঙ্গীতে, আর সুরু করছেন পরীক্ষা মূলক অনুসন্ধান, যথার্থ বিজ্ঞানীর মত। তাই একে একে চৌষট্টি-খানি তন্ত্রের সাধন, বৈষ্ণব মতবিবেক, পঞ্চভাবাশ্রয়ে সাধনা সবই করলেন সারা। অদ্বৈত বেদান্তে বেদকেও হল জানা। এরপর বৈদেশিক সাধনায় পেলেন মহম্মদের দর্শন—দীর্ঘ শ্মশ্রুবিশিষ্ট গম্ভীর এক পুরুষ শ্রীঠাকুরের দেহে হয়ে যান লীন। শ্রীঠাকুর হয়ে যান সমাধিস্থ। খৃষ্ট ধর্মের সাধনায় পঞ্চবটী আলো করে এসে দাঁড়ান ঈশামসি স্বয়ং—শোভন সুন্দর, নয়নে অপূর্ব্ব দীপ্তি, যুগযুগ মথিত করুণাবতারের দেহ যায় মিলিয়ে শ্রীঠাকুরের সমাধিলীন দেহে। নিজে যেমন বলতেন, রত্নাকরের তীরে বাস করে যেমন মনে হয় আরো কত আছে দেখি সাগর গর্ভে। তেমনি কতভাবে কত রূপে ভগবানকে ভক্তেরা ডাকে, দর্শনের চেষ্টা করে, সে সব জানতে ঠাকুরের মন হত অস্থির। এ জন্যই প্রচলিত প্রতিটি প্রধান প্রধান ধর্মমত সাধনা করে সত্য বলে জেনেই তো বলতে সক্ষম হয়েছিলেন

'যত মত তত পথ' সব ধর্মই সত্য, উচুতে উঠলে সব শিয়ালের একরা'। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় সমস্ত ধর্মের মধ্যে আছে কিছু না কিছু আবর্জনা কিন্তু ঠাকুর দেখালেন যখন সমষ্টিগতভাবে দেখা যায় তখন সব ধর্মই সত্য সেই হিসেবে প্রত্যেকটি ধর্মের প্রত্যেকটি অঙ্গ সত্য। যা আমরা কুসংস্কার বলি সে আমাদের ভ্রান্তি। এমনি করেই সব মতের অবতার, প্রফেট বা মুর্শিদ পদবীতে হলেন প্রতিষ্ঠিত। বর্ত্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ, একত্বের যুগ। এ যুগের মানুষ সারা বিশ্বকে একসূত্রে চায় বাঁধতে, তাই এ যুগের ঠাকুরও নিয়েছিলেন সব ধর্মের সাধনা ও সিদ্ধি।

অবতারদেরও আছে ক্রম, আছে বিবর্ত্তন—তাই তো বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ঠাকুরকে বললেন, অবতারবরিষ্ঠ।

নিরক্ষর জ্ঞানসিন্ধু ঠাকুরের এক একটি বাণী সম্বন্ধে কত কথা বলা যায়। ঠাকুরের এই ধর্ম সমন্বয়ী সাধনার ফলে ধর্মে ধর্মে বিভেদ নিয়ে দলাদলি, সঙ্কীর্ণতা চলে গেছে। সমগ্র বিশ্বে ভ্রাতৃত্ব, প্রীতির প্রচেষ্টা, U. N. O. প্রভৃতি গড়ে ওঠা মনে হয় সবই ঠাকুরের মাথা কাটা তপস্যা ও সমন্বয় সাধনার ফল।

> **"তোমরা সারে মাতে আছ -বেশ আছ, আমি বেশি**
> **কাটিয়ে জ্বলে গেছি।"**

এই কথাটার মধ্যে আধুনিককালের একটি প্রধান মতবাদ চার্বাকবাদ প্রকাশ পেয়েছে। সেই মতে Other world বলে কিছু নেই, eat, drink and be merry। ঠাকুর তপস্যার আগুনে নিজেকে জ্বালিয়ে গেছেন। সারে, মাতে কথাটির মধ্যে string আছে। এই যে পরকাল সম্বন্ধে অজ্ঞতা, অসচেতনতা, এতে পরলোকের অন্ধতমঃ যখন নেমে আসবে তখন কি হবে?

> **"দাসত্ব করতে করতে, চাকরী করতে করতে একটা**
> **দাস-সুলভ মনোবৃত্তি গড়ে ওঠে।"**

ঠাকুর ঠিক কথাই বলেছেন। দীর্ঘ দিন দাসত্ব করতে করতে

এমন মনোভাব গড়ে ওঠে যে, মানুষ নিজের আত্মার মুক্ত সত্তার সম্বন্ধে চিন্তা করতেই ভুলে যায়।

একবার আমার সামনে একটি টেলিফোন বেজে উঠল। আর্দ্দালী দাঁড়িয়েছিল—টেলিফোন ধরে হ্যালো বলে যেই শুনল, পুলিশের বড় অফিসার ফোন্ করছে তখনই মুখে কিছু না বলে দাঁড়িয়ে উঠে লম্বা করে একটি সেলাম ঠুকে দিল। হাসির কথা কোথায় পুলিশের বড় কর্মচারী—সে এদিকে সেলাম ঠুকে দিল। খেয়ালই নাই বাবু তার সেলাম দেখতে পাচ্ছে না। দীর্ঘ দিনের দাসত্বের ফলে গড়ে ওঠা স্বভাব। মানুষ চাকরী থেকে ছুটি পেয়েও আবার চাকরীর খোঁজে বেরোয়, হাঁপিয়ে মরে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়, retire করে কোথায় ভগবৎ চিন্তা করবে তা নয়, আসলে ওই servant সুলভ mentality গড়ে ওঠে। ঠাকুর এতরকম জানতেন ও মানুষের কথা। ঠাকুর এখানে দাসত্বের কোন নিন্দা করলেন না—কি করবে মানুষ। তবে বলেছেন যে, এ যুগে বেদমত চলে না, বেদের ক্রিয়াকাণ্ড চলে না কিন্তু বর্ত্তমানের law of association এর কথা বলেছেন। তোমরা দেখবে যেখানে একদল retired কর্মচারীদের group জমা হয়, তাদের মধ্যে আলোচনা হয়, কিন্তু সে সব কোন ধর্মীয় আলোচনা নয়। তাদের মনের মধ্যে ঢুকে রয়েছে পুরানো দিনের স্মৃতি। তোমরা যদি হেদোর ধারে যাও কি গঙ্গার তীরে যাও, যেখানে সাধারণতঃ ওই retired লোকেরা জড়ো হয়। তারা কেউ হয়তো যে সব বড় সাহেবের under-এ কাজ করেছে, তার কথা বলতে গিয়ে বলে, 'হুঁ,' এখনকার আবার officer নাকি, আমাদের অমুক officer এর কি তেজ, কি দাপট ছিল, আর এখনকার কথা বোলো না।' আবার কেউ হয়তো বাজার দরের গল্প, মাছের সের কত করে, আজ ভাল আনাজ পাওয়া গেল না এই সব নানা কথা যার যেদিকে Propensity, সেই অনুসারে কথা বলছে বা বলে—সবের মধ্যেই জড়িয়ে থাকে ওই law of association। কিছুদিন যার সঙ্গ করা

যায় তার সত্তা চলে আসে, সেই ধরণের কথা আলোচিত হয়। তাই তোমরা যারা গৃহী, সংসার প্রতিপালনের জন্য দীর্ঘদিন ধরে চাকরী করছ, তারা কিন্তু মনে মনে জপটি খুব রেখে যাবে, আর ঠাকুর তোমার দেওয়া সংসার প্রতিপালনের জন্য তোমার চাকরী করছি—এইটি মনে মনে গেঁথে নিলে retire করে মনে ওই হতাশ ভাব বা তখনও অফিসজীবন বেশ ছিল ইত্যাদি চিন্তা আসবে না, আর একদিন তো এ জগৎ ছেড়ে যাত্রা করতেই হবে।

> **"ভক্ত সুরেন্দ্রের বাগানে মহোৎসব। শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন তখন লুচি খাইনি—একটু লুচি এনে দাও··· এর মানে আছে। খাই খাই মনে হ'লে আবার আসতে ইচ্ছা হবে।"**

সাধারণ মানুষ বাসনাবিগ্রহ, সব চেষ্টাই বাসনাদিগ্ধ—Macdougal এর মতে চৌদ্দটী instincts এর অন্তর্গত। শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহ লীলা-বিগ্রহ, লীলার জন্যে শরীর ধারণ। এটি উপনিষদ বেদের ব্রহ্মের কামনা—সোহকাময়ত—এঁদের সব চেষ্টা লীলাপুষ্টির জন্যে—এর দুটি কল্যাণরূপ—ভক্তের কল্যাণ আর জগতের কল্যাণ। লীলা শেষ হলে দেহ থাকে না।

> **"গঙ্গাস্নানের সময়, পূজা আহ্নিকের সময় যত রাজ্যের বাজে কথা বলে।"**

এ একটী রোগ বিশেষ। এর সুরাহা কি করে হয়? Scientific discoveries bring spiritual debasement. Science is not the whole truth. ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় একদিন হেয়ার সাহেবের কথায় কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট দিয়ে রাত্রিবেলা আসছিলেন ভয়ে ভয়ে দুর্গানাম জপ করতে করতে। হেয়ার সাহেব অবশ্য পেছন পেছন এসে তুলে নেন। কিন্তু আজকাল যাওয়ার সময় একবারও দুর্গানাম মনে আসবে না।

> **"গঙ্গাস্নানে সব পাপ যায়। গঙ্গায় নেমে যখন মানুষটা ফেরে, পুরানো পাপগুলো গাছ থেকে ঝাঁপ দিয়ে তার ঘাড়ের ওপর পড়ে।"**

ঠাকুরের এই কথার মধ্যে একটা মস্ত বড় দ্যোতনা রয়েছে। পাশ্চাত্যের behaviouristic schools এর সঙ্গে এই কথার মিল রয়েছে। পাপ শুধু মানুষের মনেই থাকে না, atmosphereএও থাকে। এক একটা জায়গা পাপে charged হয়ে থাকে। ধর, বড়বাজার গেলেই মনটা ব্যবসামুখী হয়ে যায়। আমরা এতদিন জানতাম পাপ শুধু মনেই থাকে—তা নয় atmosphereএও থাকে। এই যে কথাটা existence per se এর মধ্যে মস্ত বড় দার্শনিক তত্ত্ব আছে। ঠাকুর খুব Pragmatic ছিলেন অর্থাৎ Practical কথা বলতেন। সাধুদের পবিত্র স্পর্শে হিমালয়ে, টিহ্‌রি, হৃষীকেশ হরিদ্বার এসব অঞ্চলে অসংখ্য সাধুরা তো নিত্য গঙ্গাস্নান করেন. কাজেই তাঁদের অঙ্গের পবিত্র স্পর্শে, তাছাড়া গঙ্গার বিশেষ পাবনী শক্তি আছে, তাতেও খানিকটা পাপ ধুয়ে যায়। মহাপ্রভু, দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর গঙ্গায় কত স্নান করেছেন, এঁদের অঙ্গের স্পর্শে তো গঙ্গা ধন্য হয়ে গেছেন, আর গঙ্গার পৌরাণিক মহিমাও যথেষ্ট। গঙ্গার জল অনেকাংশে germ free. ঔরঙ্গজেব অতো হিন্দু বিদ্বেষী, অতো অত্যাচারী সম্রাট ছিলেন, কিন্তু গঙ্গার জল ছাড়া কোন জল খেতেন না। হিমালয়ের বহু ওষধি, গাছ-গাছড়া ধুয়ে নেমে আসছেন তো মা গঙ্গা। কাজেই গঙ্গার জল সত্যিই পবিত্র। কিন্তু atmosphere এর পাপ যখন আবার ঘাড়ে চেপে বসে, তখন চাই জপ, চিন্তা, প্রার্থনা। না হলে খুব মজা তো—বেশ তেল মাখতে মাখতে গঙ্গায় নামলে, মাছের দর, বাজার দর করতে লাগলে আর সব পাপ চলে গেল তা হয় না। ওই atmosphere এর পাপ আবার ঘাড়ে চড়ে বসে।

আমি নিমতলার শ্মশানে যেতাম, বসে জপ করতাম। সেখানে কতকগুলি লোক কাঁধে গামছা নিয়ে হাওয়া খাচ্ছে আর ইলিশ মাছের গল্প করছে আর একদিকে চিতায় জ্বলছে মৃতদেহ। কতখানি মনটা তাদের স্থূল বলতো? তাদের যদি গঙ্গাস্নানে সব পাপ ধুয়ে যায় তাহলে খুব সুবিধা। কাজেই সাধুসন্তদের খুব সাবধানে চলতে হবে। একে তো মনের বন্ধন, সংস্কারের প্রভাব, তার ওপর আবার

এখনকার atmosphere একেবারে charged হয়ে আছে ভোগ বাসনা, কামনা ইত্যাদিতে। এই যে mill area-র কুলিদের হীন প্রবৃত্তিগুলো cinema ইত্যাদির প্রভাব ; সব রাশ ঠেলে আসছে মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করার জন্য। এসবের চাপে সব সময়ই মন নীচু দিকে নামতে চাইবে। তার জন্য বারবার তোমাদের বলছি খুব জপ, ধ্যান, প্রার্থনা রেখে যেতে হবে। বর্ত্তমান যুগ সাধুদের পক্ষে খুব কঠিন যুগ। বিবেকস্বামীর কর্মযোগে বলা আছে, মানুষের পাপকর্মের, অশুভকর্মের, অদিব্যকর্মের প্রভাব সেখানকার আবহাওয়ায় বিদ্ধ হয়ে থাকে, একশত বছর পরেও অন্যমানুষকে সেইভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। অবশভাবে অন্যায় করিয়ে নেয়, সেজন্য সাধুরা খুব সাবধান। বিশেষ কাজ ভিন্ন নিজের আশ্রমের বাইরে থাকবে না। লোকসমাজ থেকে যতদূর সম্ভব দূরে থাকবে। এমনভাবে মনে ছাপ দেয় লোকসমাজের প্রভাব যে চিন্তাতে আনতে পারবে না। সেজন্য আমি চিরকাল ওই একটা গণ্ডীর মধ্যে থাকতে ভালবাসি, কোথাও যাই না, অনেকে অনেক কিছুই মনে করে তবুও আমি কোথাও যাওয়া ভালবাসি না। তোমরা নিজেরা যখন কাজের জন্য বাইরে বেরোবে তখন চারিদিকে বিশেষ চিন্তা ও প্রার্থনা করে জপের গণ্ডী দিয়ে নেবে। মার মূর্ত্তি ইত্যাদি সঙ্গে রাখবে আর যতটা পারবে সর্ব্বদা মনে মনে জপের চেষ্টা তো রাখতেই হবে।

> **“শ্রীরামকৃষ্ণ—(মাষ্টার মশাইয়ের প্রতি) স্বপ্নে কিছু দেখ ? সধবা মেয়ে, শ্মশান, মশান, আগুনের শিখা ? এসব দেখা খুব ভাল।”**

ঠাকুর যা বললেন এ হল স্বপ্নতত্ত্ব বা dream theory-র খুব important কথা। বেদান্তদর্শনেও এই কথা আছে। সীমন্তিনী মায়েদের স্বপ্ন দেখলে, যে কর্ম সুরু করা হয়েছে সেই কর্ম অচিরেই সাফল্য মণ্ডিত হয়, অগ্নিশিখা তো জ্যোতির প্রকাশ, অন্তর শুদ্ধ করে, ইত্যাদি কত যে রহস্য আছে এর মধ্যে।

কি যে ঠাকুর না জানতেন, অথচ এদিকে তো নিরক্ষর-জ্ঞান-

সিন্ধু॥ পাশ্চাত্য দেশগুলি স্বপ্নতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা চালিয়েছে, আমাদের দেশেও সেই সুদূর উপনিষদের যুগ থেকে আরম্ভ করে প্রায় প্রতিটি দর্শনেই স্বপ্নতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু আলোচিত হয়েছে। এইসব আলোচনার ফলে স্বপ্নতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কিছু রহস্য জানা গেলেও সবটুকু এখনও পরিষ্কার করে বলা যায় না—প্রথমত: প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুই মতেই বলে, মানুষ সাধারণতঃ বাসনার বসে স্বপ্ন দেখে। সাধারণতঃ যে সব বাসনা মানুষ জাগ্রত অবস্থায় সক্রিয়ভাবে মেটাতে পারে না, সেগুলি বেশীর ভাগই চেতন স্তরে অতৃপ্ত হয়ে অবচেতনে আত্মপ্রকাশ করে ; তাই স্বপ্নের মধ্যে অনেক সময় মানুষ অতৃপ্ত বাসনার তৃপ্তি সাধন করে, যেমন ধন লাভের বাসনা প্রায় সকলের মনের মধ্যেই কিছু কিছু থাকে, কিন্তু ধন লাভ হয়তো হল না, তখন অনেক সময় স্বপ্নের মধ্যেই সেই সব ফলে হয়তো স্বপ্ন দেখল সে রাজা হয়েছে। না হয়তো খুব ধনলাভ করেছে। সাধু হয়তো রসগোল্লা খায় না। অথচ বাসনাটি সম্পূর্ণ যায় নি। তখন স্বপ্নের মধ্যে হয়তো সে দেখল রসগোল্লা খাচ্ছে—কাজেই বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সারাদিনের কর্মের স্মৃতি স্বপ্নের কারণ হতে পারে বা বাসনা মূলতঃ স্বপ্নের কারণ হয়ে থাকে। মানুষ যা করে বা যা দেখে তার ছাপ বা সংস্কার গড়ে ওঠে। এই সমস্ত ছাপ অধিকাংশই মানুষের বিরাট অবচেতন ক্ষেত্রে গিয়ে সঞ্চিত হয় —চেতনাস্তরে অল্পমাত্রই থাকে। ঘুমের মধ্যে যখন আমাদের বিবেক-প্রহরী ঘুমিয়ে পড়ে তখন অবচেতন স্তর আত্মপ্রকাশ করে। এই অবচেতন স্তরের পরিধি কত যে বিরাট তার ঠিকানা নাই—জন্ম জন্মান্তরের সংস্কাররাশি এর মধ্যে আছে জমা কাজেই সেই সব স্মৃতি অনুসারে বিচিত্র স্বপ্ন দেখে। তারপর ভয়, সুখ, দুঃখ, মায়া, করুণা, অহিংসা, দোষ, ঘৃণা এইসব বিচিত্র অনুভূতিও মানুষের স্বপ্নসৃষ্টির কারণ হয়ে থাকে। ভীতুস্বভাবের লোক স্বপ্নে অনেক সময় ভয় পায়।

স্বপ্ন সম্বন্ধে আমার একটা কথা মনে হয়—মানুষ ক্ষণমাত্রও কিছু

না করে থাকতে পারে না। এটি তার শরীরের functional দিকও বটে আবার বাহ্যিক সক্রিয়তাও বটে—তাছাড়া মানুষের মনও মুহূর্ত্ত মাত্র কিছু চিন্তা না করে থাকতে পারে না আর এই মানসিক চিন্তা বা কল্পনা, এতে আমাদের মধ্যে অবস্থিত জীবভূত সনাতন তৃপ্তি পানও খুব বেশী। এই চিন্তাধারা, এই কল্পনা-বিলাস মানুষের ঘুমের মাঝেও চলতে থাকে—মানুষ হয়তো মনে করে কিছুই ভাবছি না, কিন্তু গভীরভাবে মনকে study করলে দেখবে, কোন মানুষ কিছুই না ভেবে থাকতে পারে না—দীর্ঘ সময় কিছু না চিন্তা করে যদি কেউ মন স্থির রাখতে পারে তাহলে সে তো সমাধিস্থ হতে পারত। কিন্তু তা তো হয় না। কাজেই ঘুমের মাঝেও জীব-চৈতন্য কল্পনা করতে ভালবাসে, চিন্তা করতে ভালবাসে, সেগুলিই তার স্বপ্ন সৃষ্টি করে।

কিন্তু যারা ভক্ত বা সাধক তাদের লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন ঘুমের মধ্যে শুভস্বপ্ন, দিব্যস্বপ্ন সৃষ্টি হয়। অনৈতিক, অদিব্য মোহকরী স্বপ্ন যেন আমরা না দেখি—এজন্য ঘুমের আগে জপ করে ইষ্ট স্মরণ করে শুয়ে পড়তে হবে, আর record রাখতে হবে কি স্বপ্ন দেখলাম। এই ভাবে চেষ্টা রেখে গেলে অবচেতনের গভীরেও ঠাকুর ঢুকে পড়বেন। জৈন ধর্মের ঐ আচরণটি খুব ভাল লাগে—জৈন ধর্মে বলা আছে গভীর রাতে ঘুম ভাঙ্গলেই উঠে প্রার্থনাশীল হবে—সব মতের মধ্যেই শিক্ষণীয় কত জিনিষ আছে।

জীবচৈতন্যের তৃপ্তির বিলাসেই স্বপ্ন সৃষ্টি—এই স্বপ্নের আবার আধার অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকাশ—সহজ মনের মধ্য দিয়ে এই বিলাস বা তৃপ্তির সহজ প্রকাশ, জটিল মনের মধ্যে এর জটিলতা। এই তৃপ্তি আধার অনুযায়ী শ্রেয় বা প্রেয় হয়। কিন্তু আমাদের চেষ্টা হওয়া উচিৎ যেন শ্রেয় স্বপ্নবিলাসে আমাদের প্রতিষ্ঠা হয়।

"সাধু সাবধান"।

সব জিনিষ আমাদের আকর্ষণ করছে। আবার বিকর্ষণ করছে। এটা আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত। তাই যেখানে আকর্ষণ সেখানেই বিকর্ষণ

হবে। সাধু সাবধান (শ্রীঠাকুর)। পৃথিবীর বুকে যদি ধর্মকে বাঁচিয়ে রাখতে হয় তা' হলে সাধুদের খুব সাবধানে চলতে হবে। যা দিন কাল প'ড়ছে, সব যেন চলে যেতে বসেছে; অবিদ্যার প্রভাব এত বাড়ছে ও বাড়বে যে সাধুদের খুব বিচার করে চলাফেরার দিকে খুব নজর করে চলতে হবে। আর এই পৃথিবীর বুকে ধর্মকে বাঁচিয়ে রাখতে হ'লে সব সাধুদের একত্র হ'তে হবে। একা একা কাজ করলে হবে না। সাধু সম্প্রদায় এক জোট হ'য়ে ধর্ম ও সমাজরক্ষার্থে চেষ্টা করতে হবে।

"দুটি 'ক' থেকে সাবধান"।

দুটি 'ক' থেকে খুব সাবধানে থাকবে। সাধু হয়েছ কি মহামায়ার আক্রোশ বাড়ে। মহামায়া বলেন, দাঁড়া ব্যাটা আমার ঘরে আগুন লাগাবি। রোষ, আমি তোকে দেখাচ্ছি মজা? এই বলে, ফেলে দেন গোলমালে। কাজেই খুব সাবধান। রোজ তোমরা তার কাছে প্রার্থনা করবে, 'মা, আমায় পথ ছেড়ে দাও—মা আমায় রক্ষা কর। শুধু তপস্যা ও পুরুষকার হলেই চলবে না, তার সঙ্গে প্রার্থনাটিও চাই।

মানুষ যখন সাধু হয় তখন তাদের ভেতর জ্বলে যায়, বেরিয়ে পড়ে ঘর ছেড়ে কিন্তু সেই জ্বালাটি তপস্যা করে বজায় রাখতে হবে—তা না হলে সাধু থাকতে থাকতে সংসারের দিকে আবার মন দৌড়য়। মনে হতে পারে, তাইত সংসারীরা বেশ আছে ইত্যাদি —ব্যস, এই যেই মনে হওয়া, অমনি সংসারে গতি হয়।

প্রথম প্রথম সাধুর মনে বেশ আকুলতা, অনুরাগ থাকে কিন্তু ক্রমশঃ কমতে থাকে, শুকোতে থাকে—শেষে মনে হবে, সাধু হয়ে কি হল? সংসারে থাকলেই ভাল হত। এখন যুগ বড় খারাপ পড়েছে —সাধুদের মাঝে মাঝে বড় মাথা গোলমাল হয়ে যায়। এ যুগে মহামায়ার খেলা বেশী—চট্‌করে কিছুতেই অবস্থা লাভ করতে দেয় না। ভোগমুখী proneness-টা তো যাবে না একেবারে কিন্তু চেষ্টা করতে হবে। ধর, রসগোল্লার দিকে মন ছুটছে, তখনি তুমি ছুটলে ঠাকুরের

শ্যামপুকুরের দিকে —এমনি ভাবে মোড় ফিরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু বড় বড় বিষয়ে মন যখন ছুটবে, তখন রাশ টেনে ধরবে। প্রতি মুহূর্ত্তে চেষ্টা করতে করতে immunity এসে যাবে। যেমন electricity নিয়ে যারা কাজ করে, তাদের দু'বার পাঁচবার shock খেতে খেতে immunity এসে যায়। অন্য লোকে ভয় খায়, কিন্তু তাদের ভয় থাকে না। তেমনি চেষ্টা করতে করতে, ক্রমশঃ immunity grow করবে। যেমন 'রসগোল্লা খাব না' করতে করতে একদিন দেখবে যে, খাবার ইচ্ছা খসে যাবে। কিন্তু সর্ব্বোপরি ঠাকুরের নাম করে যাবে। সর্ব্বদা নাম করার চেষ্টা করবে, কারণ যিনি মহামায়ার ব্যবস্থা করেছেন— তাঁকে স্মরণ করলে সব ঠিক হয়ে যাবে। বন্ধন মুক্তিও হয়ে যাবে 'মায়ামেতাং তরান্ততে' তিনিই মুক্তি দেবেন।

"সন্ন্যাসী নারী হেরবে না।"

তোমরা যারা সাধু— মাতৃজাতি সম্বন্ধে খুব সাবধান। এ যুগে খুব দূরত্ব রাখা সম্ভব না হলেও মায়েদের সঙ্গে যখন কথা বলবে তখন অন্ততঃ সাত হাত দূরে, খুব কমপক্ষে তিন হাত দূরেও থাকার চেষ্টা করবে। আমার সাধনার সময় আমি তো খুব কৃচ্ছ্রতা করেছি। মায়েদের মুখতো এই কিছুদিন আগে পর্যন্তও দেখতাম না। ভালমা ইত্যাদি বাড়ীর মায়েদের মুখও দেখতাম না। আমি ধ্যানের সময় ছাড়া যখন নীচে নামতাম তখন খড়মের আওয়াজে সব সরে যেত। ভালমার (দাদার স্ত্রী) দীক্ষা হল—কাগজে লিখে বলার (দাদার মেয়ে) হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। কলেজ গেছি সেও ওই নিম্নদৃষ্টি। তো দু-চারজন বন্ধু মাঝে মাঝে যে ঠাট্টা করত না তা নয়। ছেলেদের স্বভাবই তো দুষ্টুমি করা। হয়তো মায়েরা একজন যাচ্ছে, তখন স্কটিশ কলেজে দু একজন পড়ত তো ছেলেরা তখন রঙ্গ করে বলতো, ভাই, একবার মুখ তুলে দেখ। আমার তখন কঠিন তপস্যায় সমস্ত জ্বলে যাচ্ছে— তাদের কথা গ্রাহ্যই করতাম না—এই রকম কঠোর করেছি।

আমি যে ঘরে জপ ধ্যান করতাম সেই ঘরে ভাল, ভাল সব বিলাতী ছবি ছিল। কর্ত্তা (পিতৃদেব) টাঙিয়েছিলেন, Seanymph-এর ছবি ছিল, তারপর Echo-র ছবি ছিল—আগেকার সব খুব সুন্দর সুন্দর বিলাতী ছবি-তো আমি ওই সব ছবি খুলে এক জায়গায় গাদা করে রেখেছিলাম, যাতে চোখ না পড়ে, তারপর দু-চারদিন বাদে দেখলাম কর্ত্তা বকলেন না, তখন সেগুলি নষ্ট করে ফেলি। আমি তখন মায়েদের ছবিও দেখতাম না। একটী বুদ্ধদেবের ছবি আমার খুব ভাল লাগে, কিন্তু চরণতলায় সুজাতার ছবি ছিল, দর্শন করতে গেলেই চোখে পড়ত, তাই পটুকে (ভাই) বলে সেটি একটি গোলাপ ফুলের ছবি কেটে ঢাকা দেওয়া করিয়েছিলাম।

তোমরা যতটা পারবে মাতৃজাতি থেকে সাবধান থাকবে। জগতের যত মাতৃমূর্ত্তি, সবই সেই এক বিশ্বমাতৃকারই প্রতিমূর্ত্তি। কাজেই সাধু ব্রহ্মচারীরা প্রতিটি মাতৃমূর্ত্তিকে, মাতৃদৃষ্টিতে দেখবে। আর নিজেদের মনে করবে শিশু-সন্তান।

“কেল্লায় নেমে যাওয়ার মত”।

বাইরে কিছু ঘটবার আগে অন্তর্লোকে সূক্ষ্মলোকে সেটী ঘটে। হোঁচট খাবার আগে মনটা পড়বার জন্যে তৈরী হয়ে থাকে। প্রত্যেকটী ভোগের আগে মনটী প্রথমে ফোঁস করে ওঠে কিন্তু পরে ধীরে ধীরে নেমে আসে। শ্রীঠাকুরের কথা “কেল্লায় নেমে যাওয়ার মত।” গভীর রাত্রে উঠে বিচার করবে “মন কি চাস?” বুক নিঙ্‌ড়ে করবে ঠাকুরকে লাভ করবার প্রার্থনা। প্রত্যেকেই জান, নিজের মনের কোণে কোথায় ভোগের জন্যে সূক্ষ্ম বাসনা সব কাঁটার মত খচ্‌খচ্‌ করছে।

যার যে বিষয়ে হীনতা আছে সেই বিষয়ে আগে থেকে সচেতন থাকতে হয়। যেমন যার ক্রোধ বেশী তার আগে থেকে ক্রোধের বিরুদ্ধে মনকে তৈরী রাখতে হয়—বিচার এই সব করে। সর্ব্বদা সতর্ক থাকতে হবে মনের মধ্যে হীন কিছু না এসে পড়ে, চতুর্দ্দিকের অসৎ জিনিষ যাতে মনের মধ্যে না ঢুকে পড়ে। মনের মধ্যে একবার

অসৎ ভাব ঢুকলেই তখন কোন্‌দিক দিয়ে যে নেমে যাচ্ছ বুঝতে দেবে না। তাই বিপদের মাঝে যাবার আগে দেহের চারিদিকে নামের গণ্ডী দিতে হয়। খিড়কী দরজা যেমন বন্ধ রাখতে হয় তেমনি মনের হীন দিক খুলতে নাই।

"চিল শকুনি অনেক উঁচুতে ওঠে কিন্তু নজর ভাগাড়ে"।

উপনিষদে আছে, তিনি তপস্যা ক'রেছিলেন 'স তপোহতপ্যত' (তৈঃ)। তিনি কি আর নিজের গায়ে আগুন জ্বেলে তপস্যা ক'রবেন? তাঁর তপস্যা এই চিন্তন, নিজের বিষয় আলোচনা। আমরা তাঁর ছেলে, তাই আমাদেরও এই তপস্যা করা উচিৎ। তবে তাঁর মুখী যেন হয়। ঠাকুর যেমন বলেছেন "চিল শকুনি অনেক উঁচুতে ওঠে কিন্তু নজর ভাগাড়ে।" তেমনি অনেকে পণ্ডিতি করে, কিন্তু কি করে পি. এইচ. ডি. পাবো, অর্থ পাবো, এই সব চিন্তা; এমন করলে হবে না।" ভুল "পাওয়ারের" চশমা যখন থাকে তখন আসল বস্তুকে চিনতে পারবে না। যতক্ষণ না ঠাকুরের কৃপা আসছে, ঠিক চশমা না হচ্ছে ততক্ষণ কিছুতেই বুঝতে পারবে না। একবার তাঁর কৃপা পেলে সব সত্য, শিব, সুন্দর হয়ে যায়।

"স্বাধীন ইচ্ছা"।

স্বাধীন ইচ্ছার কথায় শ্রীঠাকুর খোঁটায় বাঁধা গরুর উপমা দিয়েছেন। ঠাকুরের এই গরু ও খুঁটীর কথাটী খুব উঁচু কথা। তিনি যদি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতেন তাহলে মুস্কিল হ'ত। একটি গরুকে যদি খোঁটায় না বেঁধে রাখা হয় তাহলে এর খামারে ওর ক্ষেতে গিয়ে শস্য নষ্ট করবে। তাতে তারও ক্ষতি লোকেরও ক্ষতি। তাই আমাদের যে তিনি এই স্বাধীনতার একটা সীমা রেখেছেন, এতে আমাদেরও ভাল সকলেরও ভাল। তিনি বলেন যতক্ষণ না তুমি ভাল হ'তে পারছো ততক্ষণ তোমায় ছেড়ে দেব না। যখন হবে তখন তোমায় ছেড়ে দিয়ে আমার নির্ভাবনা।

কৃপাবাদ ও স্বাধীনইচ্ছাবাদ আত্যন্তিকে একই। আমাদের মধ্যে তিনিই আছেন। তাঁর ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে। উপর দিক থেকে

দেখলে পুরুষোত্তমের কৃপা আর নীচের দিক থেকে দেখলে অহং সত্তার স্ফূরণ। গীতায় বলেছেন, "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" তাঁরই অংশ আমাদের ভিতর থেকে অহং এর খেলা ক'রছে।

"বুড়ির খেলা চলুক"।

আমরা যখন বিচার করি, আমাদের অবচেতনে একটা মাপ বা standard থাকে। বর্ত্তমানের দেশ কালটিই আমাদের মনে একটা ছাপ রেখেছে। কিন্তু এই বর্ত্তমানের মধ্যেও পূর্ব্বেকার ছাপ রয়েছে। সর্ব্বোপরি আত্মার পূর্ব্বসংস্কার বা ছাপ ত আছেই।

ঋষিদের যুগটা আমরা ঠিক বুঝতে পারব না, কারণ আমরা সে যুগ থেকে সরে এসেছি। এটা ঠাকুরের যুগ। সর্ব্বভাবে তাঁর আদর্শই আমাদের গ্রহণ করতে হবে। ঠাকুরের আলোতে আমরা চারপাশ দেখবার চেষ্টা করব। এখন অখণ্ড জগৎ, তাই ঠাকুরও সেই ভাবেরই অগ্রদূত হয়ে এসেছিলেন মহাসমন্বয়াচার্য্যরূপে। ধর্ম-চক্র যাঁর হাতে তিনি ঠিকই পাঠাচ্ছেন। এগুলি সমাজ গঠনের পক্ষে প্রয়োজন। আমার মনে হয়, একটা ব্যালান্স আছে।

আচার্য্য শঙ্করের প্রবর্ত্তিত ধর্ম খুব উঁচুতে উঠল, প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই জ্ঞানময় অবস্থা রইল না, পড়ে গেল। আসলে ঠাকুরের কথা, বুড়ির খেলা চলুক। তাঁর ঠিক করা আছে—যখন যেমন প্রয়োজন তেমনি পাঠাচ্ছেন। মহাকালের চক্রে ঘুরে ঘুরে না এলে লীলা চলে না। যেমন একটি লোক যদি ক্রমাগত এক অবস্থায় থাকে ভাল লাগে না। তাই কখন হাসি কখন কান্না। ঠাকুরেরও সেই লীলা। একজন এসে একটি ধর্মকে তুলে ধরলেন, আবার পড়ে গেল—আবার একজন এসে তুলে দিলেন। এ লীলা বিলাস চলছে যুগ যুগ ধরে।

ঠাকুরের এই ব্যালান্স নিয়ে লীলা। ছেলে যদি শুধু বই নিয়ে পড়ে তাহলে মা বাপের ভাল লাগে না। আবার শুধু খেলে বেড়ালেও ভাল লাগে না। ঠাকুরের বেলায়ও তেমনি। আমরা

শুধু যদি বনে বনে সন্ন্যাসী হয়ে ঘুরে বেড়াই, এও ঠাকুরের ভাল লাগে না। কি ব্যষ্টি কি সমষ্টি সব বিষয়ে। এমনি করে ঠাকুরের ব্যালান্স নিয়ে খেলা চলছে। 'ভাল মন্দ হচ্ছে, মন্দ ভাল হচ্ছে। "বুড়ির খেলা চললেই আনন্দ।"

"বোম্বাই আমের গাছেতে নেকো আম হয় না
বোম্বাই আম হয়, হয়তো একটু তফাৎ হয়ে যায়।"
—শ্রীশ্রীঠাকুর

প্রশ্ন—কিন্তু বিদ্যাসাগরের ছেলে, চিত্তরঞ্জনের ছেলে, গান্ধীজীর ছেলে এরা সব একেবারে উল্টো প্রকৃতির কি করে হয়?

আম গাছের সঙ্গে মানুষের তুলনা কেন করা হয়? সেটি এই হিসেবে যে চৈতন্যময় সত্ত্বা সবেতেই আছে। সবেরই ভিতর সেই চৈতন্যময় সত্ত্বা রয়েছেন। তবে' Question of degrees, কারুর ভিতর কম degree-এর প্রকাশ, যেমন একটা পাথরকে ভেঙে ছোট করতে হয়—দেখতে প্রায় একরকম হয়, যদিও আকারে ছোট হয়। কিন্তু তাঁর চৈতন্যের প্রকাশ গাছের মধ্যে বেশী, সেজন্য একটা গাছের চারা ঠিক তার মতই হয় না। কোন চারা থেকে বিশাল মহীরুহ হল, কোনটা বা নুয়ে পড়া গাছ হল। যার ভেতর চৈতন্য প্রকাশের degree যত বেশী হয়, তার ভিতর পরিবর্ত্তনও তত বেশী হয়। সব ময়ূর, সব হরিণ, সব কাক প্রায়ই একই রকম দেখতে হয়। কিন্তু সব মানুষের গঠনভঙ্গী ঠিক মানুষ হিসাবে এক হলেও দেখতে অনেক তফাৎ। আর গুণের ক্ষেত্রে তারতম্য আরও বেশী দেখতে পাওয়া যায়। বাবা হয়ত ভাল কিন্তু ছেলেটা একেবারে তফাৎ। খুব দুষ্ট প্রকৃতির হল। সুশ্রী পিতার সন্তান সব সময় সুশ্রী হয় না। মানুষের ভিতর চৈতন্যের প্রকাশ বেশী, তাই তফাৎ বেশী। কাজেই মানুষের বেলা গাছের example খাটে না, তবে কিছু কিছু মেলে। আর তাছাড়া simile-কে নিয়ে বেশী টানাটানি করা চলে না।

> **"কি জান? মানুষ সব দেখতে একরকম, কিন্তু কারু ভিতর ক্ষীরের পোর"।.........**

সংস্কারগুলিই পোর। সুসংস্কার যথা—ঈশ্বরকে জানবার ইচ্ছা এগুলি ক্ষীরের পোর। Psychology অনুসারে মানুষের brain-এ দুটি অংশ—আহার, নিদ্রা, লোভ, হিংসা, চঞ্চলতা, ইত্যাদি সমস্ত lower brain-এর কাজ, আর বুদ্ধি, চিন্তা, গান, কবিতা ইত্যাদি সূক্ষ্ম গুণ সমস্ত upper brain-এর কাজ—মানুষ সেই কোন্ আদিযুগ থেকে lower brain-এর কাজ করে আসছে, সেজন্য lower brain-ই মানুষের developed বেশী। ভাল কাজ, ভাল চিন্তা, দিব্য চিন্তা, এসব ক্রমাগত করতে করতে দেখবে তোমরা, upper brainএ সূক্ষ্ম সমস্ত channel সৃষ্টি হবে, মনও সেই খাতে বইতে থাকবে। কাজেই শুভ সংস্কার গড়ে ওঠার জন্য অন্যায় আর কিছুতেই করতে পারবে না—করব মনে করলেও পারবে না। আর সর্ব্বোপরি যদি ঠাকুর সংস্কার হরণ করে নেন তো আলাদা কথা, তখন সংস্কার মুক্ত হওয়া যায়—কিছু কঠিন হয় না।

> **"ঠাকুরশ্রীরামকৃষ্ণ—হাজরার সঙ্গে নরেন্দ্রনাথকে বেশী মেলামেশা করতে বারণ করছেন, বলছেন এমন সব আছে, মুখে রাম নাম করে কিন্তু বগলে ইট।"**

হাজরা মশায় এদিকে জপতপও করতেন আবার ওদিকে ভেতরে ভেতরে দালালিও ছিল। ঠাকুরের কিরকম অদ্ভুত Psychology জ্ঞান, এদিকে দেহের হুঁশ থাকত না, বগলে কাপড়, কিন্তু আবার প্রত্যেকটি দিকে অদ্ভুত লক্ষ্য থাকত।

অফিসে, বাজারে, এধার-ওধার একদল লোক দেখা যায়, তাদের মুখে খুব মিষ্টি ব্যবহার কিন্তু ভেতর ভেতরে ঠিক তার উল্টো।

হাজরা মশায়ও ঠাকুরের কাছে যেতেন, দক্ষিনেশ্বরে গিয়ে থাকতেন। কিন্তু ভেতরে ভগবৎলাভ চেষ্টার বদলে টাকা-পয়সার চাহিদা, লোকমান্য অথচ বাইরে দেখাতেন যেন জপ-তপে কতই মন। এই মিথ্যাচারের জন্যে ঠাকুর স্বামিজীকে তার সঙ্গে বেশী মিশতে-বারণ করলেন। ঠাকুর যে কত রকম জানতেন।

> **"দয়া কিরে? কীটাণুকীট তুই, দয়া করবার তুই কে? সেবা—সেবা, শিবজ্ঞানে জীব-সেবা। এই কথা শুনেই স্বামিজী বলেছিলেন ঠাকুর আজ বনের বেদান্তকে ঘরে ঢোকালেন। কত বড় কথা বললেন বলতো"।**

এক দিক দিয়ে দেখলে এক কোণে বসে জপ করাটাও স্বার্থপরতা, ঠাকুর এই জগতে এক নূতন জিনিষ দিয়ে গেছেন-- শিব জ্ঞানে সেবা, চৈতন্যদেব বলেছিলেন "জীবে দয়া" কিন্তু ঠাকুর বললেন, "দয়া কিরে সেবা, শিবজ্ঞানে সেবা; দয়া ঈশ্বরের, তোর ক্ষমতা কি যে তুই দয়া করবি।" তাই স্বামীজী বলে গেলেন— "ঠাকুর যে কি বড় জিনিষ করে গেলেন, বনের বেদান্তকে ঘরে ঢোকালেন"। যে বেদান্তবাদী সব মায়া, একমাত্র ব্রহ্ম সত্য বলে বসেছিল তাকেই দেখালেন জীব, জগৎ, সব শিব; তিনিই সব হয়েছেন। মিথ্যা নয়। আগে বিশ্বাস ভক্তি ছিল বটে কিন্তু সে বিশ্বাস বা ভক্তিসুর সঙ্কীর্ণ ছিল, নিজের কল্যাণ নিয়েই পড়ে থাকত। তারপর ধর্মে দলাদলি উঠে যাচ্ছে, দিকে দিকে সেবা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। ঠাকুরের মনে দীন নারায়ণের সেবার প্রয়োজনবোধ জাগায় সারা জগতের মনীষীদের মধ্যে এই ভাবধারা ছড়িয়ে পড়েছে। রুশো, টলষ্টয় ইত্যাদি ঋষিপ্রতিম পুরুষদের মনেও সেইজন্য দেখি জনকল্যাণের ইচ্ছা জেগেছিল। ঠাকুর, শিববতার স্বামীজী এঁদের বিরাট ইচ্ছার প্রভাবেই আজ দেশে দেশে দিকে দিকে দীন-নারায়ণদেব জন্য গড়ে উঠেছে বিদ্যায়তন, আরোগ্যালয়।

> **"উন্মাদ অবস্থায় লোককে ঠিক ঠিক কথা, হক কথা বলতুম। কারুকে মানতাম না। বড়লোক দেখলে ভয় হতো না।—সৌরিন্দ্র ঠাকুরের বাড়ী গিছলাম তাকে দেখে বললাম তোমাকে রাজা টাজা বলতে পারব না। কেন না সেটা মিথ্যা কথা হবে। বরাহনগরের ঘাটে দেখলাম, জয় মুখুজ্যে জপ**

> করছে, কিন্তু অন্যমনস্ক তখন কাছে গিয়ে চাপড় দিলাম। একদিন রাণী রাসমণি কালী ঘরে এসে অন্যমনস্ক হয়ে ফুল বাচ্ছে। অমনি দুই চাপড়” ॥

এইটি গুরুভাব। এই যে উন্মাদের কথা বলছেন, ঠাকুরের তখন গুরু ভাবের বিশেষ প্রকাশ। যিনি সর্বদাই দীনের দীন হয়ে থাকতেন সবারই নমস্কার এমন করে ফিরিয়ে দিতেন যে, কেউ তাঁকে আগে নমস্কার করতে পারতো না। সেই তিনিই আবার রাণী রাসমণিকে দু'চাপড় মারছেন। রাজা যতীন্দ্রমোহন, সৌরীন্দ্র মোহনকে কঠোর তিরস্কার করছেন। এমন কি এই গুরুভাবের আত্মপ্রকাশে, একবার হৃদয়ের সঙ্গে কালনায় গিয়ে মহাভাগবত ভগবানদাস বাবাজীকেও তীব্র শাসন করে এসেছিলেন। এই গুরুভাব কিন্তু তিনি অধিকাংশ সময় সংবরণ করে রাখতেন।

> “শ্রীশ্রীঠাকুর—শ্রীম কে বলছেন—‘সাধছিল বিয়ে করব, সাধ আহ্লাদ করব’ ইত্যাদি”।

এখানে মাষ্টারমশায়ের সঙ্গে ঠাকুর একেবারে আপনজনের মত বলছেন, আপনার স্বরূপ ভুলিয়ে দিয়ে তাঁর সঙ্গে একেবারে সাধারণের মত কথা বলছেন। অথচ ঠাকুরের কি অবস্থা। এগুলো হচ্ছে-- একেবারে আপনজনের মত ছাপ দেবার পদ্ধতি। একেবারে নির্ব্বিকল্পে লীন হলে তো লোকে ভয় পাবে, কাছে আসবেই না। কাজেই একেবারে সাধারণ লোকের মত লীলা করছেন। কথামৃত যত পড়া যায় তত আস্বাদ পাওয়া যায়—তত মিষ্টি লাগে।

> “ওদেশে যাচ্ছি বর্দ্ধমান থেকে নেমে, আমি গরুর গাড়ীতে বসে—এমন সময় ঝড় বৃষ্টি। আবার গাড়ীর সঙ্গে কোত্থেকে লোক এসে জুটলো। আমার সঙ্গের লোকেরা বললে, এরা ডাকাত। আমি তখন ঈশ্বরের নাম করতে লাগলাম। কিন্তু কখনও রাম রাম বলছি কখনও কালী কালী, কখনও হনুমান হনুমান সব রকমই বলছি-এ কি রকম বল দেখি”।

আসল কথাটা হচ্ছে ঠাকুর নিজেকে এত গোপন করতে পারতেন

যে, তা বলা কঠিন। শ্রীমায়ের সঙ্গে যখন মাঝ মাঠে ডাকাতের দেখা হল, তখন মায়ের স্বরূপ দেখে ডাকাতের মনের পরিবর্ত্তন হয়ে গেল। তিনি হাজার হলেও মাতৃমূর্ত্তি আর ঠাকুর পুরুষোত্তম হয়ে একটা কিছু করতে পারতেন না? খুব পারতেন। কিন্তু ঠাকুরের এও এক গোপন লীলা।

> **“ঠাকুর—ডাঃ রুদ্রকে নিজের ভাবের কথা বলছিলেন·—টাকা ছুঁলে শরীরের কুঞ্চন ও শ্বাস রোধ ইত্যাদি”।**

ঠাকুরের এ সব ভাবের তাৎপর্য্য বা কার্য্য-কারণ আবিষ্কার করা খুব কঠিন। কারণ মহাপুরুষদের জীবনে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের কথা পড়েছি, দেখেছি কিন্তু এইরূপ শারীরিক প্রতিক্রিয়া কখনো দেখিনি বা শুনিনি। শরীর ও মনের interaction এর কথা পাশ্চাত্য Psychologyতে আছে। কিন্তু ঠাকুরের এই reaction যে দেহ মনের সংঘাত তা নয়। কারণ ঠাকুরের অজ্ঞাতে বিছানার নীচে টাকা রেখেও দেখা গেছে—ঠাকুরের একই প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, এ কি করে সম্ভব। এ হল Sub-conscious যাকে Jung বলেছেন race instinct, Freud বলেছেন Id বা Phantom house, তাকেও ঠাকুর দিব্য করেছেন। ছেলেবেলায় যখন instinct সব formation stage এ থাকে তখনও ঝড়ের আম কুড়িয়ে ঠাকুর বাটী আসতে পারছেন না—এখানে philosophical ethics যা শুধু আমরা ঠাকুরের জীবনে দেখতে পাই।

টাকা ছুঁলে ঠাকুরের দৈহিক প্রতিক্রিয়ার সম্ভাব্য কারণ মনে হয় --টাকা হল Economics-এর ভাষায় Funded value—জমাট বাঁধা ভোগের প্রতিরূপ হল এই টাকা। ঠাকুরের ত্যাগবোধ এত সুগভীর যে ভোগের উপায় স্বরূপ টাকা স্পর্শে তাঁর ত্যাগশীল দেহমনে প্রতিক্রিয়া দেখা দিত।

"সকলের ঘড়ি সূর্য্যঘড়ির সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হয়"।

সূর্য্যঘড়ি মানে এখানে ঠাকুর বা অবতার পুরুষ—ভগবান—আমাদের মনঘড়ি ঠাকুর বা অবতার পুরুষের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে!

গ্রীণ উইচ্ meantime যেমন Standard time; সমস্ত ঘড়ি যেমন গ্রীণ উইচ্ mean time এর সঙ্গে মেলালে ঠিক হয়, তেমনি আমাদের মন ভগবানের সঙ্গে বা অবতার পুরুষের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হয়। এখন কথা হচ্ছে যে, অবতার পুরুষ বা ঠাকুরকে তো সবাই সব সময় পায় না, বা একেবারেই পায় না তারা কি করে নিজের ঘড়ি তাঁর সঙ্গে মেলাবে? অবতার পুরুষ বা ঠাকুর প্রত্যেক যুগে যে উপদেশ দিয়ে গেছেন সেই উপদেশ অনুসারে চলা অন্ততঃ কতকটাও যাতে হয় সেই চেষ্টাটি রাখতে হবে। নিজের মনের ওপর নজর রাখতে হবে। যেমন গীতামুখে ভগবান বলেছেন—'লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্মনামশমঃস্পৃহা। রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ॥' ১৪-১২। যখন তোমরা দেখবে লোভ বাড়ছে, নিত্যনূতন কাজে জড়িয়ে পড়ছ বা কর্মস্পৃহা বাড়ছে, চঞ্চলতা বাড়ছে আর ইষ্ট চিন্তায় নিবিড়তা কমে যাচ্ছে তখন বুঝতে হবে তোমাদের মধ্যে রজোগুণ বাড়ছে—আর রজোগুণ বৃদ্ধি হলে মৃত্যুতে মুক্তি নাই, ফলও দুঃখ, পুনর্জন্ম ইত্যাদি। এই রকম তমোগুণ সম্বন্ধেও বলা আছে। তা ছাড়া যে যে পথের সাধক, সেই পথের যে শাস্ত্র নির্দ্দেশ বা চৈতন্য মহাপ্রভু, দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর, বুদ্ধদেব ইত্যাদি এদের নির্দ্দিষ্ট পথ অনুসারে কতটা চলা হচ্ছে সেই সেই ভক্তেরা লক্ষ্য রাখবে, আর প্রার্থনা ও ইচ্ছাশক্তি সহায়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও রাখতে হবে। সর্ব্বোপরি গুরুদত্ত নাম ও ঐকান্তিকভাবে ইষ্ট স্মরণ কতখানি হচ্ছে এটি নজরে রাখলেও এগিয়ে যেতে পারবে। এখন সূর্য্যঘড়ির সঙ্গে নিজে নিজের ঘড়ি মেলানোর কথা কি তাহা বোঝা যায়।

"মা, আরও একটা দিন যে গেল—দেখা দিলি কই"?

এই যে আরও একটা বছর চলে গেল—আমাদের বুকে কি কোনদিন জাগে : মা, আরো একটা বছর গেল—তোর দিকে এগিয়ে গেলাম কই ?

হাসি কান্নায় রাঙা বছর যে এমনিভাবে একটি একটি করে খসে পড়ে ধীরে মহাকালের স্রোতে বিলীন হয়ে যাচ্ছে সপ্তপর্ণের রাঙা রামধনুর মত—আমরা কে কতটুকু প্রস্তুত হচ্ছি ? মনে মনে খতিয়ে দেখা উচিত—হিসাবের খাতায় কতটুকু থাকছে জমা, আর কতটুকু হচ্ছে বাজে খরচ।

এই বিরাট মহাকাল দাঁড়িয়ে আছেন—এক হাতে তাঁর বজ্রাগ্নি আর এক হাতে বরাভয়। গীতা মুখেও বলেছেন—এক রূপে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন দ্রষ্টাসাক্ষী স্বরূপে আর একরূপে তিনি মহাকাল, রুদ্রভয়াল 'কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ'। তাই আমাদের প্রার্থনা—এই কালের পারে যে পুরুষোত্তম ঠাকুরটী, তাঁর চরণে পার্থের মত প্রপন্নার্ত্তি নিয়ে আমাদের বলতে হবে—শিষ্যস্তেহং সাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্—আমরা তোমার শিষ্য, আমাদের রক্ষা কর। আর এ-যুগের ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কথা যেন অন্তর মথিত করে তোলে, যেন বলতে পারি—'মা, আমি তোমার শরণাগত।' এই শরণাগতের রক্ষা যে তাঁর যুগে যুগের দায় ?

"গরীবদের জামা কাপড় না দিলে, তীর্থে যাবেন না বলে ঠাকুরের মাঝপথে বসে পড়া"।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কি রকম চিত্র এখানে আঁকা হয়েছে। আর মহাপ্রভুর কথা ভাবতেই মনে কি ওঠে কীর্ত্তনে গরগর গৌরসুন্দরের রূপ, নয়নে প্রেমবারি,—নেচে চলেছেন—আসমুদ্র হিমাচল নেচে নেচে বেড়িয়েছেন, আর অকৈতব হরিনাম বিলিয়ে চলেছেন—মুহূর্তে মানুষ সোনা হয়ে গেছে। আর, এ-যুগের ঠাকুর যথার্থ কমিউনিজম্..

প্রতিষ্ঠা করলেন। গরীবের ঠাকুর, দীনের ঠাকুর, কাজেই কমিউনিস্টদের উচিৎ ঠাকুরকে নেওয়া।

> "শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আসন
> গ্রহণ করা"। —শ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি—

অন্যান্য অবতারে ঐশ্বর্য্যের খেলা দেখিয়েছেন—মহাপ্রভু জগাই-মাধাই দুই পাষণ্ড উদ্ধারের সময় নিত্যানন্দ প্রভুকে মারার জন্য 'সুদর্শন সুদর্শন' ইত্যাদি বলে হুংকার ছেড়ে ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ, শক্তির প্রকাশ দেখিয়েছেন। অবশ্য চক্র স্মরণ মাত্রই পাষণ্ডরা কেঁদে গড়াগড়ি গেল, পায়ে জড়িয়ে ধরে উদ্ধার হয়ে গেল, কিন্তু দক্ষিণেশ্বর লীলায় ঠাকুর কত সময় কত লোকের কাছে অপমানিত হয়েছেন, জুতো রাখার জায়গার কাছে বসে খেতে বলেছে। এঁটো হাতে ছোঁয়া পান খেতে বলেছে, ছোটবেলায় গাঁয়ের বামুনরা একঘরে করে দিয়েছে, তো কোথাও ঠাকুর শক্তির প্রকাশ করলেন না, একবার যদি রক্ত চক্ষে কটাক্ষ করতেন তাহলেই তারা ভয় পেয়ে যেত—কিন্তু ঠাকুর কিছুই করলেন না—বরং গ্রামের জেলে, মালা, মুচি, বাগ্দি, হাড়ি, ডোম, এদের মধ্যেই বসে পড়লেন—'কই দাও নাগো একপাত' বলে। এবারের ঠাকুর একেবারে কমিউনিস্টদের ঠাকুরটি হয়ে এলেন। কমিউনিস্টরা যদি কোন অবতারকে গ্রহণ করে, তো সে একমাত্র আমাদের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে। গিরীশ ঘোষজা মশায় বলতেন—অন্যান্য অবতারে এক একজন এক একটি অস্ত্র নিয়ে এসেছেন। এবারে ঠাকুরটি প্রণাম অস্ত্র নিয়ে এলেন। যেখানেই গোলমাল সেখানেই এত নত হতে পারতেন যে বলার নয়—একেবারে জোড় হাত—ব্যাস আর কারো কিছু বলার থাকে না। চৈতন্য আসনে ঠাকুর যখন গিয়ে বসলেন ভাবাবস্থায় তখন সেখানকার বৈষ্ণবরা নিশ্চয় কিছু না কিছু বলে ছিলেন তাই পুঁথিকার বলেন, 'অল্পবুদ্ধি' তারা তাই জানল না যে—ঠাকুরকে বললে মহাপ্রভুকেই বলা হল—এমনকি তৎকালীন বৈষ্ণব-সমাজের প্রধান ভগবানদাস বাবাজীও নাকি কটাক্ষ করেছিলেন এই নিয়ে। পরে অবশ্য সে ভুল

তাঁর ভেঙ্গে ছিল। এই ঘটনা শ্রীঠাকুর তীর্থ পরিক্রমা পথে যখন কালনায় সিদ্ধ ভগবানদাসজীর আশ্রমে যান তখন ঘটে।

এক্ষেত্রে একটি কথা ননে হয়— যে শক্তি যত সংহত সে শক্তি তত প্রসারশীল—দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরটি কোন ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ, কোন শক্তির প্রকাশ দেখালেন না, নিজেকে সংহত করে রাখলেন, কিন্তু ঠাকুর যাবার পর, মাত্র কিছুদিনের মধ্যেই ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়লেন সারা বিশ্বময়। এযাবৎ সমস্ত অবতার পুরুষের থেকে ঠাকুরই প্রায় সারা বিশ্বের ঘরে ঘরে পূজা পাচ্ছেন, একি কম কথা!

সমীকরণ

“গুরু ও ভাগবৎ এক”

গুরু + কৃষ্ণ + বৈষ্ণব = ১ = ভাগবৎ + ভক্ত + ভগবান
গুরু + বৈষ্ণব = ভাগবৎ + ভক্ত -- কৃষ্ণ + ভগবান
গুরু = ভাগবৎ + ভক্ত − বৈষ্ণব
গুরু = ভাগবৎ ॥
গুরু + কৃষ্ণ = ভাগবৎ + ভক্ত − বৈষ্ণব + ভগবান
গুরু + কৃষ্ণ = ভাগবৎ + ভগবান
গুরু = ভাগবৎ + ভগবান − কৃষ্ণ
গুরু = ভাগবৎ

পরিশিষ্ট

১

"ভগবানের নামের বীজ কতটুকু" তা থেকেই কালে ভাব ভক্তি প্রেম এসব কত কি হয়।"

কি অপূর্বকথা। এই এক টুকরো কথার মধ্যে লুকিয়ে আছে কত গভীর তত্ত্ব। সাধক বা ভক্ত যদি আন্তরিক ভাবে অনুরাগের সঙ্গে নাম করে তাহলে ধীরে ভাব, ভক্তি, প্রেম, বৈরাগ্য বা অন্তরেন্দ্রিয়ের সংযম আপনি সবই হয় ওই নামের গুণে। আর সর্বোপরি নামীকে লাভ হয়। ক্ষুদ্র একটি বীজের মধ্যে যেমন লুকিয়ে থাকে বিরাট মহীরুহের সম্ভাবনা। বীজ রোপিত হলে কালে পত্র, পুষ্প, শাখা-প্রশাখায় বিলসিত হয়, ঠিক তেমনি নামের মধ্যে লুকিয়ে থাকেন স্বয়ং নামী। বৈষ্ণব শাস্ত্রেও নামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হয়েছে। মহাপ্রভু বললেন, 'হরের্নামৈব কেবলম্' কলিযুগে শুধুমাত্র আন্তরিক-ভাবে নাম করলেই সব হবে। নাম নামীর কাছে পৌঁছে যাবার খেই। নামব্রহ্ম সম্বন্ধে বলা হয়েছে উপনিষদে। গীতায় ভগবান বলেছেন, 'বীজং মাং বিদ্ধি' অর্থাৎ বিশ্বসৃষ্টির সূক্ষ্মতম বীজ হচ্ছেন ভগবান নিজে। বীজেই নামের বীজ কথাটি ব্যবহার খুবই শাস্ত্র সম্মত বলা হয়েছে। গীতায় ভগবান আরও বলেছেন, যজ্ঞানাং জপ যজ্ঞোঽস্মি—নাম জপের শ্রেষ্ঠ মহিমাই প্রকাশিত হয়েছে এই কথায়। তুলসীদাসও নাম মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেছেন। অবশ্য কতকটা ব্যজস্তুতিও বলতে পারা যায়। শ্রীরামজীর চেয়ে শ্রীরামজীর নামের শক্তিকে বড় করে বর্ণনা করেছেন।

রাম এক তাপস তিয়তারী
নাম কোটিফল কুমতি সুধারী।
ভজেউ রাম-আপুভব চাপু
ভব ভয় ভঞ্জন নাম প্রতাপ॥

শ্রীরামজী শুধুমাত্র অহল্যা উদ্ধার করেছিলেন। কিন্তু রামনাম কোটি কোটি খলকে উদ্ধারে সক্ষম। শ্রীরামচন্দ্র একটিমাত্র হরধনু ভঙ্গ করেছিলেন কিন্তু রামনাম প্রভাবে লক্ষলক্ষ মানুষের ভব বন্ধন খণ্ডন হয়।

কলিকালে নামই সম্বল ও সর্ব্ব সাধ্যসার। এসম্বন্ধে তুলসীজী খুব কথা বলেছেন—

এহি কলিকাল ন সাধন পূজা
যোগ যজ্ঞ জপতপ ব্রত পূজা।
রাম হি সুমিরিয় গাইয় রাম হি
সন্তত শুনিয় রামগুণ গ্রামহি।

কলিকালে যাগযজ্ঞ, সাধন দ্বিতীয় কিছুই নাই। একমাত্র নামই সম্বল। মা সারদা নারায়ণী স্বয়ং, কাজেই পল্লী-জননী হয়ে এলে কি হবে, কথার মধ্যে সরস্বতীর জ্ঞানগর্ভ কথা প্রকাশিত হচ্ছে।

"নির্বাসনা চাই" —শ্রীশ্রীমা

মায়ের এই এক টুকরো কথার মধ্যে কত না গভীর দ্যোতনা লুকিয়ে আছে। সত্যিই বাসনার বিষে যদি আমাদের দেহমন জ্বরে থাকে তাহলে অমৃতের আস্বাদ আমরা পাব কি করে? ঋষিরা তাইতো দীর্ঘদিনের সাধনার পর বললেন—পরম উপলব্ধির কথা—'ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানুষু' ত্যাগের পথেই মেলে অমৃতের সন্ধান। এই ত্যাগই তো নির্বাসনা। এককথায় বলতে গেলে, নির্বাসনা প্রার্থনা করতে হয়। বাসনাই কেবল দুঃখের মূল, বারবার জন্মমৃত্যুর কারণ, আর মুক্তিপথের অন্তরায়। কথাটা খুবই সত্যি, মনে হয়, এই বাসনাটি মিটিয়ে নিলেই হবে, কিন্তু হয় না, তখনই মনে হবে, এর সঙ্গে একটু গরম চা কি চানাচুর হলেই ভাল হয়, তারপর মনে হয়, একটা মিষ্টি হলে হত। তো এই হচ্ছে কথা একটা বাসনা থেকে হাজার বাসনার উৎপত্তি হয়। প্রথমে হল একটু ভাল করে পাশ, তারপর হল ভাল চাকুরী, তারপর একটা বাড়ী, তারপর bank-এ বেশ মোটা অঙ্কের টাকা হলে ভালই হয়। এরপর আরও আছে।

যাই হোক, মা বলেছেন বাসনা হতেই দেহ। একটুও বাসনা না থাকলে দেহ থাকে না। একেবারে নির্বাসনা হল তো সব ফুরাল। কাজেই এই পৃথিবীতে বারবার জন্মমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে চাই নির্ব্বাসনা, শ্রীমার এই বাণী যেন শূন্যবাদী গৌতমবুদ্ধের কথারই প্রতিধ্বনি—গৌতমবুদ্ধের বাণী, জগৎ দুঃখময়, কিন্তু তৃষ্ণাই (তন্‌হা) সমস্ত দুঃখের কারণ। তাই তৃষ্ণার পরিসমাপ্তিতেই নির্ব্বাণ।

আর একটি কথা, এই প্রার্থনাটি মা বলেছেন, যারা ভগবৎলাভে ইচ্ছুক তাদের জন্য। এখন ভগবৎ লাভ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ লাভ কাজেই ভগবৎলাভ করতে গেলে মূল্যস্বরূপ দিতেই হবে সমস্ত বাসনার বিসর্জন। 'সব ছোড়ে তো সব পাওয়ে।' কাজেই খুব তাড়াতাড়ি ভগবৎলাভ করতে গেলে নির্বাসনা হতে হবে, আর তা না হলে ওই অভ্যাসযোগ অবলম্বনে 'শনৈঃ শনৈঃ উপরমেৎ' এগোবার অর্থাৎ ধীরে ধীরে এগোতে হবে। আর একটি কথা হচ্ছে মনটাকে খুব high pitch-এ tune করা বা ideal খুব high রাখা।

"মনের প্রথম কথা শুনতে হয়"।—শ্রীশ্রীমা

একটি বাণীর কথা আমরা আজ ধারণার চেষ্টা করব—প্রাচ্যও পাশ্চাত্যের মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে। মা বলেছেন, "মনের প্রথম কথা শুনতে হয়।" এই মনের কথা গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস্ মানতেন। তিনি তাঁর দেহত্যাগের আগে বলে গেছেন, "আমি ভগবানের বাণী শুনে নিরূপিত করেছি, মানুষের বাণীতে তাঁর বিপরীত আচরণ করতে পারি না।" বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী য়ুঙ্ এর সঙ্গে ফ্রয়েডের মতভেদের কারণ য়ুঙে্র ভগবৎ প্রীতি। তিনি বলেন প্রত্যেক অনুসন্ধিৎসুর উচিত হচ্ছে জগৎকে সেই কথা বলা যে কথা তার আত্মার বাণী স্বরূপে তিনি পান।…ফ্রয়েড তাঁর অন্তরের কথা ঠিকভাবেই বলতে চেয়েছেন যেটি হচ্ছে মানুষের পশুত্ব, (animality) আর দুর্দ্ধর্ষতা (violence) তেমনি তার নিজের ও তাঁর কাছে যারা চিকিৎসার জন্যে আসে তাদের অন্তরের আস্পৃহা (aspiration) ও অসীম ভাগবৎ তৃষ্ণার কথা ভাগবতের কাছে বলার দায়িত্বও তাঁর আছে।

(Historical introduction to modern Psychology P. 336). এই intuition বা মনের কথা যে আমাদের সহজাত তা তিনি বলেছেন—মনের কর্মপদ্ধতির (operations) চারটি বিভাগ আছে—sensing, feeling, thinking, intuiting. তিনি বলেন আমাদের মনের যে প্রাণশক্তি (libido) আছে সেটি উক্ত চারিটি কর্ম পদ্ধতিতে প্রবিষ্ট হয়ে পড়ে। (ibid. P. 335) কাজেই মনের প্রথম কথা আমাদের কোন বিশেষ বা রহস্য কথা কিছু নয়। এটি স্বাভাবিক ভাবেই প্রকাশিত হয়, তাই মা বলেছেন, মনের প্রথম কথা শুনতে হয়। তার কারণ এই কথা প্রজ্ঞার কথা বা intuition-এর কথা। রুসোঁ এই আন্তর প্রেরণাকে সত্যের স্থান দিয়েছেন, আর বান´স্ একে সাধারণ বুদ্ধির উপরে স্থান দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। Intuitionist দের মতবাদ সত্য স্বপ্রকাশ। ডেকার্টে, রিড্, স্পিনোজা প্রভৃতির এই মত। ম্যাকডুগালের মতে সহজাত প্রবৃত্তিগুলিই (instincts) গৌণ ও মুখ্যভাবে মানুষের সব কাজের প্রেরণা যোগায় (Introduction to Social Psychology,-- P. 105) এই সহজাত প্রবৃত্তিই মনের প্রথম কথা বলে ধরে নিতে পারলেই আমাদের প্রেরণার মূল উৎসকে আমরা ধরতে পারব ও শ্রীমার কথার মূল্যও দিতে পারব।

প্রাচ্যদর্শনে যৌগিক প্রত্যক্ষের কথা আছে। প্রশস্তপাদ তাঁহার ভাষ্যে এ বিষয়ে বিশদ বিচার করেছেন। তবে তিনি বলেন, প্রতিভা-জ্ঞান সাধারণ মানবের জীবনে সময়ে সময়ে উপস্থিত হয়। জয়ন্তভট্ট তাঁর ন্যায়মঞ্জরী'তে এই মত বিবৃত করেছেন। তাঁর মতে, এই প্রকার জ্ঞান সত্য। ইহা মন ও স্মৃতির উপর নির্ভর করে ও ইহা কার্য্য-কারণ নিয়ম সাপেক্ষ। ইহা ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান নহে বা অনুমান সাপেক্ষ নহে।

সাংখ্যের মতে সমস্ত বস্তুই বর্তমানে অবস্থিত। ত্রিবিধ বিরোধাপত্তেশ্চ, (সাংখ্য সূত্র-১—১১৩ আর নাশ অর্থ কারণে লয় (নাশঃকারণ লয় ১—১২১ সাঃ সূত্র)। যে বস্তুর যেরূপ শক্তি

আছে সেই বস্তু তাহার অনুরূপ শক্তিসম্পন্ন বস্তু থেকে উৎপন্ন হয়। কার্য্য-কারণ থেকে পৃথক। তাহা প্রত্যক্ষও হয় একথা সাংখ্যে রয়েছে (সাঃ সূত্র ১—২২৫)। বিজ্ঞান ভিক্ষুও বলেন যে, যোগী সমাধিপ্রাপ্ত শক্তিসহায়ে দূরবস্তু ও গুপ্তবস্তু দর্শনে সমর্থ হন। বেদান্তের জ্ঞানও স্বতঃ প্রামান্য। যেহেতু ব্রহ্ম নিজে স্বপ্রকাশ তত্ত্ব। মীমাংসাদর্শনেও এই কথাই পাই। তাহাদের জ্ঞান স্বয়ং দৃঢ়। প্রভাকর কুমারিল এদের সকলেরই এই মত। জৈনদেরও একমতে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানও প্রত্যক্ষ, মনোরাজ্যের সূক্ষ্ম জ্ঞানও প্রত্যক্ষ। সমন্বয়ীদর্শন (পৃঃ ৭-৯, পৃঃ ১৮-১৯)। ন্যায় মতেও প্রত্যক্ষজ্ঞান স্বপ্রকাশ, জ্ঞানলক্ষণ জ্ঞানও ঐরূপ।

বিভিন্ন দর্শনের নিরিখে আমরা দেখতে পাই শ্রীমার এই কথার কত গভীরতা। শ্রীঠাকুর তাই বলতেন, 'ও সারদা সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে'। শ্রীমা পরাজ্ঞান দিয়ে আমাদের সব দুষ্কৃতি দূর করুন এই আমাদের প্রার্থনা।

"সব এক সময়ে সৃষ্টি হয়েছে। যা হয়েছে সব এককালে হয়েছে, একটি একটি করে হয়নি"।—শ্রীশ্রীমা

উপনিষদে আমরা পাই, "অহং বহু স্যাম"—আমি বহু হবো। 'একংসৎ' ব্রহ্ম-কামনা দেশ-কাল-পাত্র কিছুই মানেন না। তিনি যে মুহূর্ত্তে চিন্তা ক'রলেন, সেই মুহূর্ত্তেই সমস্ত সৃষ্টি বিলসিত হ'লো। আমাদের কাছে হয়তো এদের প্রকাশ সময় সাপেক্ষ, evolution process-এ আমাদের কাছে সব ধীরে ধীরে প্রকাশিত হ'চ্ছে; কিন্তু তাঁর কাছে মাত্র একক্ষণে প্রকাশ।

Royce-এর Eternal moment—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—মহাকালের কাছে এক মুহূর্তে প্রকাশ। বুদ্ধিশালী মানুষের তৈরী এ্যাপোলো, স্পুটনিক ঘড়ির কাঁটা ধরে গেছে, আবার ঘড়ির কাঁটা ধরে ফিরে এসেছে। এবং এইটি যাঁরা সৃষ্টি করেছেন, সেই বৈজ্ঞানিকদের কাছে এইটি সৃষ্টি করবার আগেই এর ভূত, ভবিষ্যৎ,

বর্তমান সব কিছু তাঁদের মানসরাজ্যে ধরা ছিল। Bergson-র Elanvital ও Duree দুটিই আছে। চিরচলমান এই Elanvital (ইলাভিতা) নিত্য নিত্য নব নব প্রকাশনায় ইনি লীলাময়।

এককালেই সব সৃষ্টি করেছেন,—মানে এই নয় যে তাঁর লীলা থেমে গেছে, তাঁর লীলাও নিত্য, শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন।

আমাদের কাছে সেটি বিপরীত মনে হয়, contradictory মনে হয় কিন্তু তাঁর কাছে লীলা সত্য, নিত্য ও সত্য, শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন। কিন্তু আমাদের কাছে এটি অচিন্ত্য। লীলা আজও থেমে যায়নি এবং ভবিষ্যতেও চলবে অথচ সেই লীলা তাঁর কাছে নিত্য বিরাজিত এই তত্ত্ব আমরা বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারবো না। এটি বুদ্ধির পারের রাজ্য।

কেবলাদ্বৈত বেদান্ত অবশ্য সৃষ্টি মানে না। এদের মতে—'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন'। এখানে বহুর স্থান নেই, এখানে এক সচ্চিদানন্দ-ব্রহ্মই আছেন।

ঠাকুর বিশিষ্টাদ্বৈতবাদটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন তাঁর কথামৃতে। এতে অবশ্য ঈশ্বর মানা হ'য়েছে এবং তাঁর শক্তি লক্ষ্মীকেও মানা হয়েছে। তাঁর মতে সৃষ্টি যেমন এ জগতেও সত্য পারমার্থিকেও তেমনি সত্য।

ওদেশের সৃষ্টিতত্ত্বে প্লেটোর আদিতে Ideas আছে তা আমরা পেয়েছি এই Idea থেকে কতকগুলি অপুষ্ট ধারণা নিয়ে আমাদের এই বিশ্বজগতের প্রকাশ। তাঁর এই Ideal world এ ঈশ্বরের স্থান আমরা নির্দিষ্ট করে পাই না, তবে The Good বলে তিনি যেটি বলেছেন সেটি world of ideas এর প্রধান তত্ত্ব বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

কোন কোন গ্রীক দার্শনিকের মতে প্রথম চারিটি Element সৃষ্টি। এর থেকে এই বিরাট সৃষ্টি, আবার কেউ কেউ দুটি তত্ত্ব love and hate বলেছেন এবং এর থেকেই বহুর প্রকাশ। Alexander তাঁর Time-space-diety থেকে সৃষ্টির উদ্ভব বলেছেন। কিন্তু এই

time-space-continuum ধীরে ধীরে জড় থেকে চেতনে পৌঁছেছে। এবং এই তত্ত্বে বলা হয়েছে nesus of diety—দেবতা এখনও দেখা দেননি। আইনষ্টাইনের time-space-continuum-কে ভিত্তি ক'রে এঁরা সৃষ্টি তত্ত্বকে নিয়ে যাচ্ছেন ঈশতত্ত্বতে।

Russell প্রমুখ Neutral particulars-কে সৃষ্টির আদি করে নিয়েছেন। কিন্তু এদের মতে একটা বিরাট চৈতন্যময়ের যে ইচ্ছা খেলা করছে তা অনেক সময় আমাদের ভুল হয়ে যাচ্ছে। science-এর সৃষ্টি Prof. Gamo-র মতে প্রথমে হাইড্রোজেন গ্যাস ভরা বিরাট আকাশ ছিল, সেটা ঘুরতে আরম্ভ করে, তখন তার ভেতরকার balance নষ্ট হওয়ায় ধীরে নক্ষত্র প্রভৃতির সৃষ্টি হল ও পরে সূর্য্য ও গ্রহ উপগ্রহাদির সৃষ্টি। কিন্তু এই গ্যাস হঠাৎ ঘুরতে আরম্ভ করলো সেটা কার ইচ্ছায়—? science সেখানে নীরব। এখানে অবশ্য একক্ষণেই সৃষ্টি হয়ে গেছে কিন্তু এখানে চৈতন্যের খেলা নাই। কিন্তু শ্রীশ্রীমা-ই কেবল বললেন,—তিনিই একক্ষণে সব করেছেন। বাংলার এক অখ্যাত পল্লীর নিরক্ষর মাতৃজননীর এই কথার গভীরতা যেটুকুমাত্র বুঝতে পারি সেইটুকুই আমরা এখানে বোঝাবার চেষ্টা করেছি। দর্শনের প্রজ্ঞা দৃষ্টিতে পাওয়া সত্য coherence, correspondence, pragmatic সত্যের সবচেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য; একথা ধ্যানদৃষ্টির কথা—আমাদের দেশের ঋষিরা এই নিয়ে দার্শনিক হয়েছিলেন।

ওদেশেও বাগর্শ প্রভৃতি এই প্রজ্ঞা সত্যকে সবচেয়ে বড় স্থান দিয়েছেন কিন্তু তাঁর মতে এই প্রজ্ঞা হবে স্বার্থ গন্ধহীন, সংস্কার বিহীন প্রাণের বিরাট প্রকাশ।

> **"যাতে লোকের উপকার হয় তা করতে হয়। তবে নিজের মন সায় দিলে করবে—না হলে নয়"।**
>
> **—শ্রীশ্রীমা**

পূজ্যপাদ স্বামিজী মহারাজের কথা—শ্রীঠাকুরের একটি কথা নিয়ে

ঝুড়িঝুড়ি দর্শন লেখা যায়, শ্রীমাকে ঠাকুর স্বয়ং বলেছেন—"ও সারদা, সরস্বতী"। শ্রীমার কথাতেও স্বামিজীর ঐ বাণী প্রযোজ্য।

শ্রীমার এই বাণীটির মধ্যে বহু তথ্য নিহিত আছে। "উপকার কথাটি নীতিশাস্ত্রে বহু ভাবে বহু অর্থে গৃহীত হয়েছে। পাশ্চাত্যের মতবাদে প্রাক ঐতিহাসিক যুগে, কোন কর্মের নৈতিক মূল্য নির্দ্ধারিত হ'ত, tribe বা "গোষ্ঠির" নিরূপিত আইন বা law অনুসারে। পরবর্ত্তী কালে সমাজ সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক প্রথা, আচার পদ্ধতি, নিয়ম শৃঙ্খলা আমাদের কোন্ কর্ম কল্যাণকর, কোন্‌টি অকল্যাণকর, উচিত-অনুচিত-এর নির্দ্দেশ দিত। রাষ্ট্র ব্যবস্থাপিত নিয়ম পরবর্ত্তী কালে সমাজের যেটি হিতকর ও উচিত তারই বিধান রাষ্ট্রের শক্তির সাহায্যে সমাজের উপর পালনের দাবি করে। দার্শনিক 'হবস্' 'বেন' প্রভৃতিদের এই মত। 'ডেকার্টে' 'লক' প্রভৃতির মতে শ্রীভগবানের আদেশই নৈতিকতার মাপকাঠি। শাস্ত্র লোকোত্তর পুরুষদের বাণী, আপ্তবাক্যই ভগবানের বাণী রূপেই গৃহীত হয়। এই সব মতগুলি কল্যাণকর কর্মের বাইরের নির্দেশ। কিন্তু আমাদের অন্তররাজ্যেও কল্যাণ কর্মের মাপকাঠি আছে।

জগতের কল্যাণ বলতে যে কি বলা হয় বোঝা মুস্কিল। কেউ বলেন সুখই কল্যাণকর। অর্থাৎ সব মানুষই যখন সুখ চায় তখন যত পার সুখের আয়োজন করে যাও। কেউ বলেন নিজের সুখ (চার্ব্বাক ইত্যাদি)। কেউ বলেন সবারই সুখ। কেউ বলেন (স্পেনসার) "দীর্ঘ কর্মময় জীবন।" কেউ বলেন utility (বেনথাম), greatest happiness of the greatest number—প্রয়োজনোপযোগিতা, আবার বৃহত্তম সংখ্যার বৃহত্তম সুখ। কেউ বলেন (কান্ট) "ন্যায়সঙ্গত ইচ্ছা"—অর্থাৎ ভোগের ইচ্ছা হচ্ছে, ভোগ করব না—কারণ তা ন্যায়সঙ্গত ইচ্ছা নয়, তা আমাদের কর্ত্তব্য নয়। এইটিকেই কান্ট পূর্ণ মঙ্গল বলছেন। আর এইটিই ধর্ম। কেউ বলেন আত্মার পূর্ণ বিকাশ (self realisation)। প্লেটো, গ্রীণ, এঁদের এই সব মত। তারপর (highest good) ন্যায় সঙ্গত

চিন্তাশীল মানবের পূর্ণ পরিতৃপ্তি—যত প্রকার মূল্য আছে তাদের পূর্ণ পরিণতি। এ সবই কাজের সময় গোলমেলে মনে হয়। কাজেই জগতের কল্যাণ যেকি সেটি আমরা ঠিক বুঝব না। সত্যকার কল্যাণ হয় ভগবৎ-পথে ইষ্ট পথে যদি পড়া যায়। পবিত্রতা, ত্যাগ এই সবে প্রকৃত কল্যাণ। স্বার্থ ত্যাগ করতে পারলে সবারই কিছু কল্যাণ করা যায়। যদি স্বার্থহীন প্রাণ থেকে কোন স্পন্দন ছাড়া যায় তা'হলে তাতেই জগতের কল্যাণ হবে। আর সেই স্পন্দন চারিদিক থেকে আরও similar waves পাবে এবং multiply করবে। আর তাতেই জগতকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তাই জগতের কল্যাণের জন্য নিঃস্বার্থ স্পন্দনের সৃষ্টি করতে হয়। আসল কথা অপরের কল্যাণ করতে হলে আগে নিজের 'অকল্যাণ করতে হবে। না হলে অপরের কল্যাণ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া ঠিকমত বিশ্বের কল্যাণ একমাত্র তিনিই করতে পারেন। তাই বিশ্বের কল্যাণ করতে হলে আগে সেই পরম কল্যাণতম সত্ত্বাকে লাভ করতে হবে।

গীতায় শ্রীভগবান এই লাভের, এই আদর্শের কথাই অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলে গেছেন।

পাশ্চাত্য মতবাদে আত্মবিকাশের পদ্ধতির বিশেষ কোন নিরিখ আমরা পাই না। কিন্তু গীতায় ভগবান অর্জুনকে লক্ষ্য ক'রে সমগ্র মানবতাকে নিয়ে গেছেন এই পদ্ধতিতে। কর্মই আমাদের চরম আদর্শের পথের দিশারী। অলস জীবন কোন দেশে, কোন কালেই আদর্শ হতে পারে না বা হয় নাই। গীতার কর্ম নিষ্কামকর্ম-ব্রাহ্মী-স্থিত। স্থিতপ্রজ্ঞ হয়ে বশীভূত ইন্দ্রিয় নিয়ে কর্মই মুক্তির কারণ ভাগবত লাভের কারণ। নিষ্কাম কর্মের চারিটি অঙ্গ আছে। সর্ব-কর্মের ফল ঈশ্বরে অর্পিত হওয়া, ফলাকাঙ্খা বর্জ্জন, কর্তৃত্ব অভিমান ত্যাগ আর ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সবকর্ম করা। এই বিরাট জগতে এক বিরাট কর্মযজ্ঞ অনুষ্ঠিত, সেই বিরাট বিশ্বযজ্ঞের হোতা—অধিযজ্ঞ হচ্ছেন—পুরুষোত্তম স্বয়ং। তিনি এই বিশ্বরক্ষার্থে নিরন্তর

কর্ম নিরত। আমরা সকলেই এই কর্মযজ্ঞের অংশভাগী। তবে আমরা আদর্শ কর্মী হয়ে তাঁর বিশ্বযজ্ঞের সহায় হতে পারি। মানবের দৈব ও আসুর সম্পদ আছে। এর মধ্যে দৈবসম্পদযুক্ত মানব মুক্তকর্মের অধিকারী। দৈবসম্পদগুলির সংখ্যা গীতামতে ছাব্বিশটি, যথা—অভয়, সত্ত্বশুদ্ধি, দান, দম স্বাধ্যায় ইত্যাদি। সাত্ত্বিক কর্মই নিষ্কাম কর্ম এই কর্মই মুক্তির দ্বার। কর্মের ফলাফল অপেক্ষা কর্তার বাসনাত্মিক বুদ্ধিই কর্মের শুভাশুভ বিচারের মাপকাঠি। এইগুলি গীতার নৈতিক কর্মের বিচার। বৌদ্ধিক দর্শন নীতির দর্শন। এ দর্শনে সংযম হচ্ছে প্রধান কথা। প্রথমতঃ চেতনা সংযম বা ইচ্ছার সংযম। দ্বিতীয়ত মনোবৃত্তির সংযম—তৃতীয়ত মনঃসংযম চতুর্থত বাক্য ও দেহের সংযম। মনোবৃত্তির সংযম বলতে সাধারণ ভাবে চিত্তসংযম্, মনকে সাধুকর্মে ও সাধুচিন্তায় নিযুক্ত রাখা, গীতাদিতে অভিভূত না হওয়া, জ্ঞানে সর্ব অবস্থায় সংযত থাকা, আর সর্বদা ইচ্ছাশক্তিকে সংযত জীবনে নিযুক্ত রাখা। এইগুলি বৌদ্ধধর্মের নীতি বা নৈতিক জীবনের পদ্ধতি। শ্রীমার বাণীতে আমরা 'শব্দবারী' শাস্ত্র বাণীর অরণ্যে পথ হারাই না।

মা বলেছেন,—'কি চাইতে কি চাইবে 'নির্বাসনা চাই।' এই বাসনাই সমস্ত বন্ধনের মূল। ভগবান বুদ্ধদেবও এই কথাই বলেছেন। মা'র কথায় সহজ প্রার্থনার কথাই আছে। আর সার কথাটি আছে। ভগবান বুদ্ধদেবকে ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি নিরুত্তর থাকতেন এই জন্যে যে প্রথম করণীয়গুলি না করে আমরাও বড় বড় বিষয় নিয়ে বৃথা চিন্তা করি। প্রথম পাঠ পড়া শেষ না করে আমরা এগিয়ে যেতে চাই জ্ঞানের দিকে। মাও তাঁর শিষ্য সন্তানদের ভালভাবেই জানেন আর জানেন বলেই প্রথম পাঠের উপায় দিয়েছেন নির্বাসনা। তাই বলেছেন কি চাইতে কি চাইবে এক কথায় বলতে গেলে নির্বাসনা প্রার্থনা করতে হয়।

সত্যিই আমরা বাসনার বশে বাসনার জিনিষই চেয়ে নিই ঠাকুরের কাছে। কাজেই সেই বাসনার বীজটিকে ধ্বংস করতে

প্রার্থনা জানাতে হয়, তারপর যা আসবে সে কল্যাণের জিনিস। কিন্তু বাসনাসিদ্ধ মনে ঠিক কল্যাণের নিঃশ্রেয়ময় বিধান পাওয়া যায় না, তাই শ্রীমা বাসনার ধ্বংসই আগে প্রার্থনা করতে বললেন। "এরপর মনই আমাদের গুরুর কাজ করবে"—শ্রীঠাকুরের কথা। তখন যা কল্যাণতম সেই প্রার্থনাই জানাবে। তখন হৃদিস্থিত হৃষিকেশের হাতে ঠিক ঠিক ভার দিতে পারবে। বৃথা বাসনাদিগ্ধ অহংকারকে সারথি করে জীবনকুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জয়গান চাইবে না। শ্রীঠাকুরের উপমা "যতক্ষণ বিয়ে বাড়ীতে ভাড়ারী থাকে, ততক্ষণ কর্ত্তা চাবি হাতে নেয় না।" আমাদের বাসনাযুক্ত অহং-ভাণ্ডারী সরে গেলেই আমাদের অন্তর্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সারথ্য গ্রহণ করবেন।

মা বলেছেন -"লোকের উপকার করবে—তবে মন যেন সায় দেয়।" নির্ব্বাসনা হবার আগে আমাদের কিভাবে সেই পথে এগিয়ে যাওয়া যায়-এর উত্তরে মা বলেছেন—"মনের সায় চাই।" শাস্ত্র, গুরু, মহাপুরুষ এঁদের উপদেশ কল্যাণ কর্মে নিযুক্ত হওয়ার উপায়। তবে মনের সায় চাই। "মনমুখ এক করে কাজ কর! শ্রীঠাকুরের এই বাণী। এ কথাটিরও গভীর মনোবিজ্ঞান সিদ্ধ অর্থ আছে। এই মন প্রথম মন, যা অন্য একজায়গায় এটি বলেছেন, 'বাবা প্রথম মনের কথা শুনতে হয়।' এটি হচ্ছে intuition বা প্রজ্ঞার বাণী। আমাদের মধ্যে যিনি সর্বসাক্ষী, সর্ব অন্তর্যামী আছেন এটি তাঁর বাণী। যদিও সব সময় এই কথা ধরতে আমরা পারি না। শুদ্ধ মনে এ বাণীর সম্যক প্রকাশ। মহাত্মা গান্ধী একেই Inner voice বলেছেন। এই মতের সঙ্গে intuitionism মতবাদের কিছু মিল আছে।

শ্রীমার বাণীর অনন্ত দ্যোতনা আছে। আমরা তার কিছুটা এখানে আলোচনা করে

মহাকবি কালিদাসের মত,—

ক্ক সূর্য্য প্রভবো বংশঃ যত্ব চল্পি বিষয়া মাতঃ
তিতার্ষু দুস্তরং মোহাদুডুপেনাসিম সাগরম—বলেই
ক্ষান্ত হচ্ছি।

"সন্ধিক্ষনে ধ্যান করবে"। শ্রীশ্রীমা

শ্রীশ্রীমায়ের ওই যে বাণী—সন্ধিক্ষণে ধ্যান—ওর একটা গভীর scientific দিক আছে। পদার্থ বিজ্ঞানে বলে, short wave-এর গতি বহুদূর। atmosphere-এ গিয়ে শব্দ কিছুটা প্রতিসরণ হয়, আর কিছুটা প্রতিফলন হয়ে ফিরে আসে। আবার আরো ক্ষুদ্র microwave ionosphere-কেও ভেদ করে। প্রাণের স্পন্দন আরো সূক্ষ্ম, কাজেই জপ, ধ্যান, প্রার্থনা সূক্ষ্ম হলে সেই সূক্ষ্ম লোকে পৌঁছে যাবে।

কিন্তু সেটি সন্ধিক্ষণে বেশী ফল হওয়ার অর্থ হল—সূর্য্যাস্তের পর 'D' স্তর নামে Ionosphere এর যে স্তর সেটি মিলিয়ে যায়। তাই Radio সংবাদ ভাল শোনা যায়। তেমনি সন্ধ্যায় ও ভোরে প্রাণের কম্পন রামকৃষ্ণলোকে ভালভাবে পৌঁছানো সম্ভব। সেইজন্য সন্ধিক্ষণে জপ-ধ্যান প্রশস্ত। এছাড়া হিন্দুদের দর্শনশাস্ত্রে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উঠে ঈশ্বরের আরাধনা করার যে বিধান, তার আরও বিশেষ কারণ আছে; প্রথমতঃ ঠিক ওই সময়ে atmosphere ozone gas-এ বিশেষভাবে পূর্ণ থাকে। কাজেই ওই সময়ে শয্যাত্যাগ করে উন্মুক্ত স্থানে জপ, ধ্যান, প্রার্থনা করলে মনও ঈশ্বরমুখী হয়। আর প্রাণ ধারণের যে আসল ক্ষমতাটুকু, ozone gas-এর মধ্যে থাকে, সেটাও গ্রহণ করে। এজন্যে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ দীর্ঘ জীবনলাভের একটি উপায়। আর একটি কথা সারাদিনের সমস্ত কর্মচঞ্চলতায় জুড়ে যাবার আগে ইষ্ট স্মরণ করলে সারাদিনের কাজের মাঝে তার দিব্যাতিদিব্য রেশটুকু থাকে।

"স্বামিজীর কথা-ঠাকুরের এক একটা বাণী থেকে ঝুড়ি ঝুড়ি গ্রন্থ লেখা যায়"।

এও ঠিক আবার আর একটা দিক আছে। যে কোনও কথা থেকে অনেক তত্ত্ব হয়তো বের করা যেতে পারে, এমনকি

পাগলের প্রলাপেও। তাই ব'লে তার কথা আর ঠাকুরের কথা কি এক? তা নয়। কথার ভেতর দুটো দিক আছে—একটা ব্যাক্তিগত মূল্য আর একটা বস্তুগত মূল্য। যেমন একটা সোনা আর একটা কানাকড়ি। সোনার মূল্যটা তার বস্তুগত মূল্য। আর একটা পাগল তার কানাকড়িটিকে বেশ করে একটা ভেলভেট মুড়ে সিন্দুকে রেখে বলতে লাগল, আমি কোটি টাকার অধিপতি। এখন কে তাকে বোঝাবে বল? কারণ কানাকড়ির মূল্য তার কাছে ব্যক্তিগত মূল্য। তেমনি পাগলের কথাকে নিয়ে একজন পণ্ডিত যদি ফেনিয়ে বাড়িয়ে নানা কথা বলে, সেটা ব্যক্তিগত মূল্য। কেননা তার মূল্য নির্দ্ধারিত হচ্ছে পণ্ডিতের বিচারের ওপর। কিন্তু ঠাকুরের বাণীর মাঝে তার একটা আত্যন্তিক দ্যোতনা আছে, শক্তি আছে, স্ফোট আছে। কোন পণ্ডিত যদি সে বাণী নিয়ে তার থেকে নানা তত্ত্বের প্রকাশ করে তা সে পণ্ডিতের অহোভাগ্য। কিন্তু ঠাকুরের বাণীকে তার বিচারের ওপর নির্ভর ক'রতে হয় না। সে বাণীর শক্তি আপনিই একদিন প্রকাশিত হবেই হবে। আর দেশে দেশে 'ত' ছড়িয়ে পড়ছেই। কেউ যদি নাও নেয়, জোর করে, অজ্ঞাতসারে তার ভেতর সে বাণী কাজ করে যাবে। ঋষিদের বাণী, দ্রষ্টাদের বাণী, অবতারদের বাণীর বিষয় এটি খাটে।

“স্বামিজী ওগো তুমি আমায় একি করলে আমার বাবা আছে, মা আছে”।

স্বামিজীকে ঠাকুর স্পর্শ করা মাত্রই স্বামিজী সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। সমাধি ভঙ্গে চীৎকার করলেন—ওগো তুমি আমায় একি করলে, আমার বাবা আছে, মা আছে। ঠাকুরই বা এমন কেন করলেন? আর স্বামিজীই বা এমন কেন করলেন? দেবতায় দেবতায় লীলা মানুষেরবোধগম্যেরবাহিরে। শঙ্করাচার্য্যের বেদান্তভাষ্য রচনার পর ব্যাসদেব ছদ্মবেশে এসে উপস্থিত। দুজনের মধ্যে কয়েকদিন ধরে বেশ বাগবিতণ্ডা সুরু হল ব্যাসদেব বেশ প্রসন্ন হচ্ছেন মনে মনে আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্যে। কিন্তু নতুন তর্কের অবতারণা করছেন

আর পদ্মপাদ, শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য, তিনিও খুব বড় পণ্ডিত, তাঁর ওপর মীমাংসার ভার পড়ল উভয় পক্ষের। শঙ্করাচার্য্য শিবাবতার হলেও লৌকিকভাবে বুঝতে পারলেন না, উনি ব্যাসদেব স্বয়ং; কিন্তু পদ্মপাদ আচার্য্যের প্রতি ভক্তির জোরে বুঝতে পারলেন উনি স্বয়ং ব্যাসদেব—সেজন্য সবশেষে পদ্মপাদ বললেন 'শঙ্করঃ শঙ্করঃ ব্যাসনারায়ণ হরি, দ্বয়োর্মধ্যে কিং করোম্যহং'—অর্থাৎ আচার্য্য শঙ্কর স্বয়ং শিব, আর ব্যাসদেব হচ্ছেন নারায়ণের অবতার, তুজনের মধ্যে আমি কি করে বিচার করব?

তখন ব্যাসদেব প্রসন্ন হয়ে নিজের রূপ ধারণ করলেন, বললেন, আচার্য্য শঙ্কর, আমি তোমার ভাষ্য রচনায় তুষ্ট হয়েছি, তোমাকে বেদান্ত প্রচার করতে হবে ও অন্যমত খণ্ডন করে বেদান্তমতের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই কাজের জন্যে তোমার আরও ষোল বছর পরমায়ু বাড়িয়ে দিচ্ছি। এরপর আচার্য্য শঙ্করকে খুব আশীর্বাদ করলেন। গুরু কৃপায় সবই সম্ভব। ব্যাসদেবকে যেমন পদ্মপাদ বুঝতে পেরেছিলেন। অবশ্য গুরু বলতে আমি বোঝাচ্ছি সিদ্ধ গুরু, শক্তিমান গুরু, সত্যিকার সমর্থী পুরুষ। আসলে আমার কি মনে হয় জান? এসবই লোকশিক্ষার জন্য আচরণ—ঠাকুর স্বয়ং অবতার—বরিষ্ঠ, আর স্বামিজীও শিবাবতার সপ্তর্ষি মণ্ডলের প্রবীণতম ঋষি—ঠাকুর নিজ শ্রীমুখে বলেছেন, একদিন বিলোমমার্গে মন হু হু করে উঠে গেল। দেখি লাল সুরকীর কাঁড়ির মতো জ্যোতি। সেই জ্যোতির্ম্ময় লোকে সাতটি ঋষি নিবাত নিষ্কম্প ধ্যানে নিথর—তখন অলকার অমিয়া মাখা অপূর্ব্ব এক বালক মূর্তি ধরে সেই প্রবীণতম ঋষির কণ্ঠ আলিঙ্গন করে সোহাগ ভরে বলছেন, চল ঋষি, আর্ত্তধরণী কাঁদছে, আমি যে যাচ্ছি তুমি যাবে না?

কেমন চরম মনোবিজ্ঞানীর মতো আচরণ—অপূর্ব্ব সুন্দর শিশু বা বালককে কে না ভালবাসে। তাই সমাধি নিথর মনকে গলাবার জন্যে ধরলেন ভুবন মোহন বালক মূর্তি।

সেই প্রবীণতম ঋষি—সেই বিরাট আধার যখন নরেন্দ্রনাথরূপে নেমে এলেন তখন ঠাকুরের কাছে গিয়ে, ‘ঈশ্বর কি আছেন ? তাঁকে কি দেখা যায় ? আপনি কি দেখেছেন ? এসব প্রশ্ন যেই করলেন, তখন ঠাকুর তো স্বয়ং নারায়ণ—মৃদু হেসে বললেন, হ্যাঁরে হ্যাঁ, ঈশ্বর আছেন, তাঁকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়াও যায়—এইতোর সঙ্গে আমি যেমন কথা বলছি ঠিক তেমনি, আবার তোকে দেখাতেও পারি—বলেই স্পর্শ করলেন। আর স্বামিজীর আধার তো অতি পবিত্র, স্পর্শ মাত্রেই সমাধিস্থ। কিন্তু সমাধি ভঙ্গে চীৎকার করলেন, ও আর কিছু নয় ; ঠাকুরের শক্তি প্রকাশ করতে স্বামিজী অমন্ ধারা আচরণ করলেন। সবই তাঁদের লীলা, আমার যেটুকু মনে হল বললাম।

**“নরেন্দ্র—প্রমাণ না পেলে কেমন করে বিশ্বাস করি
যে ঈশ্বর মানুষ হয়ে আসেন ?”**

স্বামিজীর মধ্যে ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর সব ভাব ও মতবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। চরম অবিশ্বাস, দুর্দ্দশা, চরম প্রাপ্তি ও জগতের কল্যাণ ইত্যাদির সমন্বয় হয়েছিল। তিনি রামকৃষ্ণ জগতের পরমগুরু। আমাদের দৈনন্দিন চলাফেরা থেকে আরম্ভ করে সব কিছু তাঁর নির্দ্দেশমত চালাতে হবে—চরমদুঃখে তাঁর মনোবেদনার কিছু কিছু release এইসব কথায় পাওয়া যায়।

**গিরীশ—বিশ্বাসই sufficient proof। এই জিনিসটা
এখানে আছে এর প্রমাণ কি ? বিশ্বাসই প্রমাণ।**

এটি একটি সুন্দর sharp pun—মনোবিজ্ঞানের মতে প্রমাণ পাঁচ প্রকার, pragmatic, correspondence, coherence, testimony এবং intuition। কেউ যদি বলে ভূত দেখেছে তা প্রমাণ করতে‘ত’ তাকে দেখাতে হবে ভূত, এটি correspondence।

আমরা যা সত্য বলে জানি ও বিশ্বাস করি তার সাথে যদি কোন বিষয় মিলে যায় তাকে coherence বলা যায়। Testimony

হল অপরে যা বলেছে তা সত্য জেনে মেনে নিলে........। বিশ্বাসে তিনটি factor-thinking, feeling, willing।

বিশ্বাস যত বাড়ে জ্ঞান তত বাড়ে। বিশ্বাসের চরমেপূর্ণ জ্ঞান—“বিশ্বাসই ঈশ্বর”—‘বিশ্বাস যেন ঈশ্বরের আলো’ এনিয়ে খুব সতর্ক থাকতে হয়, যার আছে সে ধন্য। তাই আমাদের এই প্রার্থনা হে ঠাকুর ! আমাদের যে পরীক্ষা করছ তা যেন তোমার কৃপাই উত্তীর্ণ হই—বেশী পরীক্ষা করো না। আম্‌রা বড় অসহায়, আমাদের রক্ষা করো। মানুষ কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করে ? ultimately man is helpless তাই Supreme কিছুর কাছে সে আশ্রয় চায়-শরণাগতি। ঈশ্বর বিশ্বাসের এটাই মূলকথা।

পৃথিবীতে এত বিষয় থাকতে রাসেল ঈশ্বর আছেন না নাই এই-সব আলোচনা করলেন কেন ? এর মানে কি ? In the inner recess of his heart there is belief in God না হলে এত জিনিষ থাকতে ঐ আলোচনা করলেন কেন ?

বিশ্বাস সম্বন্ধে আর একটি কথা মনে হচ্ছে কোন ছেলে পাশ করবে কি ফেল করবে কি করে বুঝবে না তার preparation দেখে, তেমনি তোমরা যে যত পূজা, জপ, ধ্যান ইত্যাদি করবে তত ঈশ্বরে বিশ্বাস বাড়বে। বিশ্বাসকে খুব যত্নে রক্ষা করতে হয় ! অবিশ্বাসীর সঙ্গ এড়িয়ে যেতে হয়। অবিশ্বাস এলে নিজেকে প্রহার করতে হয়।

“চাটের লোভে গুলি খাওয়া”—গিরীশ

আসলে এগুলো হচ্ছে association-এর কথা। তোমরা যেমন চা খেতে খেতে তার সঙ্গে বিস্কুট কি চানাচুর খাওনা ? তেমনি চা হচ্ছে নেশার বস্তু আর তার সঙ্গে বিস্কুট কি চানাচুর চাই। তেমনি গুলি, চরোস, গাঁজা এসব হচ্ছে নেশার জিনিষ, তার সঙ্গেও আরও কিছু আনুষঙ্গিক অনুপান চাই যেমন—ঝালবড়া, চানাচুর ইত্যাদি।

আমি দেখেছি, গড়েরমাঠে কোন মাড়োয়ারী খেলা দেখতে গেছে ব্যাডমিন্টন খেলা হচ্ছে সে কিন্তু খেলার কিছুই বোঝে না। খেলার

মাঝে হঠাৎ খুব হৈচৈ আরম্ভ হয়ে গেছে। এদিকে মাড়োয়ারীটা বসে খেলা দেখছে আর চানাচুর চিবোচ্ছে। সে হৈচৈ দেখে জিজ্ঞাসা করছে—গোল কাঁহা হুয়া? সে মনে করেছে হয়ত ফুটবল খেলার মত গোল হবে। এখন ঐযে মাড়োয়ারীটা খেলার মাঠে খেলা দেখছে আর চানাচুর চিবোচ্ছে সেটা কিন্তু বাড়ীতে খেতে ততো ভাল লাগবে না। এটাই হচ্ছে theory of associationism। কারণ সেখানে তো পরিবেশ নাই।

তোমাদের তাই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, চাটের লোভে গুলি খাওয়া habit যেন না এসে যায়। অনেকের বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে গভীর ভাবে মেলামেশার habit আছে। বন্ধু-বান্ধবেরা সর্ব সময় তোমাদের দলে টানবার চেষ্টা করবে। এখন বন্ধুরা যদি সৎ হয় তাহলে ভয়ের কোনও কারণ নেই। কিন্তু বন্ধুরা যদি অসৎ হয় তাহলে তাদের inherent দোষগুলি তোমাদের অজ্ঞান্তে তোমাদের মধ্যে এসে যাবে। ঐ চাটের লোভে গুলি খাওয়ার অভ্যাসের মত অবস্থা। কাজেই যখনই তোমরা কোন বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে মিশবে খুব সাবধান হবে। যদি সাবধান হয়ে না মেশ আর তোমাদের বন্ধুরা যদি অসৎ হয় তাহলে তাদের অসৎ প্রকৃতিগুলি তোমাদের অবচেতন মনে এসে ভীড় করবেই।

পরিশিষ্ট

(২)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত বাণীর ভাবাবলম্বনে সঙ্গীত

ওমা তোর স্নেহের নিরিখ নাই
ব্যথার হিয়া আঁধার কোরে
নিছিস ব্যাকুল বাহুর ডোরে
চিন্‌তে তোরে চিনিনি গো—
আলোয় আঁধি পাই ॥
দয়াময়ী বলবো কেন
আনজনের মত—
ছেলের কাছে মা হয়ে কি
পর হলি গো এত
জোর কি আমার নাই ॥
জুড়বো না কর
বলবো না ধর
ছেলের জানি হিস্যে আছে
মায়ের পায়ে ঠাঁই ॥

আমি শুধু ডাকবো তোরে
আনমনে মা-মা ব'লে
তুই যেন মা আড়াল থেকে
দেখিস চেয়ে ছেলে ব'লে ॥

আমার আছে অনেক ব্যথা
অনেক কাঁদাই মিছে কাঁদা
চুসির ছলে ভুলে থাকা
ভুলেই থাকা মার আঁচলে ॥

সাঁঝের ছায়া আসেই ভিড়ে
অমাতিথির প্রদীপ ঘিরে
আঁধার আমার নয়নতীরে
ভোর তারাটি কইগো জ্বলে ॥

অবোধ ব'লে ভুলালি মা
কাঁদালি কি ছেলে ব'লে
তন্ত্র মন্ত্র জানিনা গো
মালা করে নিছি গলে ॥
তারার রাতি সন্ধ্যা হল
আরো যে একদিন মা গেল
আজো বসে লহর দেখি
লুটিয়ে পড়া গঙ্গাকূলে ॥
আপন মনের মণি দ্বীপে
জ্বেলেই রাখি যদি চুপে
দিস মা ধরা ঐ অরূপে
যাস্ নে ডুবে নীল অতলে ॥

কাজ কি আমার নামের মালায়
আমি যে গো মা-মা বলি
গুপ্ত যোগীর এই ত দেখা
অন্তরেতে নামাবলী ॥
তিনকালের এই সন্ধ্যাকালে
মনরে অবোধ তোরে বলি
ওরে ব্যাকুলতায় অরুণ উদয়
অনুরাগে যারে গলি ॥
মনে বনে ঘরের কোণে
নিজ আসন রাখরে মেলি

গেলে নানা ভোগ-বাসনা
মা-যাবো এই ছেলের বুলি ॥

বোলে দে বলগো শ্যামা
ছেলের কি চাইনা গো মা ॥
যুগে যুগে বলেছিস গো
এসেছি, হয়েছি তো
লুকানো কেন এত
ওগো ও হর-রমা।
ভবের এই ভাণ্ডারেতে
কত আর থাকব মেতে
কর্ত্তা হতে—
এবার তবে দেমা ক্ষমা ॥

পাষাণ ঘরে রইবি কেন
এমন মাটির দেউল রয় অচল
আদরেতে গর গর
(দেখ) গদাধরের হৃদমহল ॥'
ঝি ঝি কাঁদা রাতে কোথায়
কান্ত কবি ডাকছে তোমায়
বাড়ায় কি গো রাতের আঁধার
কালো চোখের রূপ কাজল।
ভাঙ্গা বুকের বেড়া বেঁধে
বেড়াবি গো কোথায় সেধে
ফিরে পাওয়া সে যে গো ছল ॥
বাঘের আসন কোথায় আছে
নাগের হারে চরণ সাজে

ডাকাত পড়া ভক্তি ফোটায়
ডাকাত দীগির অগাধ জল।

চোখের জলে দুটো কথা
ওমা তোরে যাই গো ব'লে
শেষের দিনে দিবি কি ঠাঁই
চরণে না অভয় কোলে।
কাঁটা দিয়ে কাঁটাই তুলে
ফেলতে দুটোই গেছি ভুলে
তুই তো জানিস কত কাঁটাই
চলতে হয় মা পায়ে দলে।
টেনে যত আঁধার বুকে
জ্বলতে জোনাক জানেই সুখে
আঁধারেই যে আঁধার ঘনায়
বাদল নামে রাতের দুখে॥
ভ্রমর কি রয় ফুল প্রবাসে
মরণ যে তার আলোর পাশে
নীল সাগরের ঢেউ ছুঁয়ে যে
তোরই অরূপ রূপ উথলে॥

চাঁদের রাত্তি চাইনে ওমা
চাঁদ লুটানো চরণ পেলে
মরণ আঁধার ভয় করিনে
মরণ হাসে রূপ কাজলে।
চাহনিতে জগৎ নড়ে

একটু সে কি দিবি মেলে
দৃষ্টিতে যে সৃষ্টি বিলাস
সেও কি ওমা গেছিস ভুলে।

কণ্ঠ ভরে মা মা বলি
চাইনে কিছু সে বোল পেলে
বাউল মনের আকুল কাঁদা
রূপ লুকানো শতদলে ॥

মন পাগলের কথা ভেবে
ওমা তুই দিসনে ছেড়ে
আঁধার এল এপার ছেয়ে
ওপারেও কি আঁধার ভেবে ॥
হাতে ধরা ছেলে যে মা
আলের পথে যায় না প'ড়ে
নাইত ওমা বড়াই এমন
মায়ের দুহাত ধরবো জোরে ॥
ভয় তরাসেই মা মা বলি
আঁকড়ে ধরি চরণ তলি
কুল ভোলা ঐ নদী শুনুক
সাগর ডাকে আয়রে বলি ॥
আমি ভাবি কেমন ক'রে
কোলেই আবার যাব ভিড়ে
পথিক সুবাস উদাসী যে
কুড়ির নীড়েই যাবে ফিরে ॥

কতদিন দিশাহারা রবগো মা জননী
পরশে কনক করা
ভাঙ্গা নায়ে দিবি ধরা
অকুলের কালীদহে নামিবে গো চাঁদনী
দিনে দিনে দিন গত
আগে যেতে পিছান তত

সাত পায়ে কাছে আসা
সেকি তবে কাহিনী ॥
যোগিনী সাঝেঁর কথা
বুঝিবে না তারা কি তা
অভিমানী আসি কি গো
ফিরে যাবে অমনি ॥

তুই যদি মা ধরিস হাতে
আমার কি গো থাকে ধরা
চলতে গিয়ে তখন কি আর
থাকে গো মা 'আলে' পড়া ॥
ভয়ে ডরেই জড়িয়ে ধরি
ক্ষণেই আবার ভুলে মরি
জড়িয়ে নিলে অভয় হাতে
অহংকারের রয় কি গোড়া ॥
জানিস ওমা দুষ্টু ছেলে
পিছল পথেই আগে চলে
শরণ নিতে সরেই আসি
এ দুখ আমার যায় না ম'লে ॥
আঁধার আসে তাইত' বলি
হাতে ধরা যাসনে ভুলে
তুইত জানিস কিসেই হবে
আমার গো মা বাঁচা মা ॥

হোক না দেহ ঝড়ের পাতা
দেখিস যেন যায় না এমন
তোরেই চেয়ে হেথা সেথা ॥

হাজার কথা দিতে মুছে
একবারও মা আসিস চুপে
অন্ধকারের সপ্ত সাগর
মুক্তা নিটোল পায়েই রাতা ।।
নাম নামী অভেদ সে যে
সেই আশেতে আছি বেঁচে ।
ঢেউ দোলা এই ভাঙ্গন কুলে
ভাঙ্গা তরী যাসনে ভূলে
শিব-যোগে শিব জেগেছেন
আমার শুধু নামই সাধা ।।

এগিয়ে পড়া তোরই ত' মা
আমার কোথা হাত
হাতে ধ'রে নিয়েই যাবি
কে বা সাধে বাদ ।।
ঘূর্ণিপাকে ঘুরেই মরি
কাজের কত দ'
চরণ দুটি আঁকড়ে নেব
একি গো অসাধ ।।
ব'য়েই নিয়ে যায় যে ও মা
নদীর উজান সোঁতা
পাল তুলেদে— দেবো ও মা
ছিড়া পালই কোথা ।।
যেমন চালাস্ তেমনি চলি
যেমন বলাস তেমনি বলি
সন্ধ্যা হ'লেই ডাকিস যেন
নি'সনে অপরাধ ।।

"ওঁকার রূপিণী ও মা
এরা বলে কত কি"
'বুঝিতে পারি না কিছু
জানিও না কোন কিছু'
'শরণাগত আমি'
তুমি চির শরণী ॥
"ভুবন মোহিনী মায়া"
ভুবন ভুলাইলি
ভুলাস না আমারে মা
সন্তান যে জননী ॥
"ফুল দল দিই পদে
দিই সহস্রারে আর"
"তুমি আমি আমি তুমি"
"মহাভাবে একাকার"
অন্তরেতে তুমি গো মা
চির অন্তরযামিণী
বাহিরেও তুমি মাগো
ভবে ভবতারিণী ॥

জানি জানি জানি গো মা
এও তোরি মজার খেলা
ভব সাগর মাঝে গো মা
ওঠে ডোবে কতই ভেলা।
লক্ষ মাঝে দু এক মুক্ত
বাকি সবাই আছে বদ্ধ
বুড়ি ছোঁওয়া ইচ্ছা না তোর
নইলে ফুরায় খেলার পালা ॥

চালের বড় ঠেক যে থাকে
মুড়কী খই সেথায় রাখে
গন্ধে তার ছুটে যাওয়া
জীবের ওমা ভোগের বেলা ॥
চুসি নিয়েই থাকে ছেলে
মায়ের আসা নয় সে কালে
ছুটে আসে কাতর কাঁদায়
হয় যদি গো চুসি খেলা ॥

পুরুষ প্রকৃতি শ্যামা
আদ্যাশক্তি সনাতনী
নিষ্ক্রিয় নির্গুণ যবে
ব্রহ্ম বলে তারে জানি ॥
জগৎ জননী সে যে
সৃষ্টি স্থিতি প্রদায়িনী
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ
চতুবর্গ প্রদায়িনী ॥
অনুলোমে আর বিলোমেতে
চতুর্বিংশ তত্ত্বময়ী।
মণির জ্যোতি জ্যোতির মণি
অভেদ বলে নিত্য মানি ॥
সব হয়েছেন তিনি ওগো
শক্তি বেশী কোথাও কম।
মানুষে তার প্রকাশ আরো
আরো যেথায় সত্ত্বগুণী ॥

ব্যাকুল হয়ে ডাক না ও মন
ধর্ম মা ত’ নয় গো শ্যামা
আপন হ’তে সে যে আপন ॥
মায়েই ত নেয় ছেলের খবর
খাওয়ার ভার তারি ত’ গো
নইলে সে ভার নেয় কি ওরে
ও পাড়ারই আন যে জন ॥
ঘুড়ি কেনার আব্দার যে
কেঁদে কেঁদে ছেলে করে
তেমনি ক’রে মাকে ডাকো
দেখা ত’খন দেবেই ওরে ।
বিষয় রস শুকিয়ে যাবে
কামিনী কাঞ্চনের কথা
আপনার মা বোধ হ’লে
হয়েই যাবে এই এখন ॥

ওমা তুই ভবের জলে
জেলের মেয়ে জেলের মেয়ে
জাল ফেলেছিস ভালই ওমা
ভবের খেলায় আমায় পেয়ে ॥
পালিয়ে যাবার পথ যে আছে
তবু এ মন পালায় না যে
এবার আমি লুকাবো মা
কালো ঝপের লহর বেয়ে ॥
গুরুর দেওয়া নামের জালে
পড়বি ধরা তুই যে কালে
কার জালের জোর বেশী মা
দেখা যাবে মায়ে পোয়ে ॥

আপন হাতে ধরিস যদি
রইব ধরা নিরবধি
আমিও মা ধরবো তোরে
অধরারে কাছে পেয়ে ॥

ওমা দূরে দূরে যাস কি স'রে—
দূর করা তোর হয় কি ভালো
সাঁঝের প্রদীপ মায়ে ধরে
দূর ব'লেই যে হলি কালো ॥
ভক্তি হিমে সাগর জমে
কৃপার বাতাস যায় না থেমে
কোন্ কথা তোর নেবো মেনে
ব'লে কে আর দেবে বলো ॥
মাঝে মাঝে না হয় এলি
বিশ্ব কাজের কুম্ভ ফেলি
হাজার যুগের আঁধারেতে
কৃপার প্রদীপ ক্ষণেই জ্বালো ॥

বলেন ঠাকুর ঈশ্বর যে রসের সাগর
ডুবদিবি কি ওরে নরেন তুই
মনে কর এক রসের খুলি রসেতে উচ্ছল
কোথায় নিবি ভুঁই ॥
বলেন স্বামী—আড়ায় বসে মুখ বাড়াব
রসের পিয়াসায়
বেশী দূরে গেলেই ওগো ডুবে হারাই তুই ॥
মাছির মত অবুঝ হব কেন
রসের লাগি মরণ মাগি হেন

বলেন ঠাকুর সাগর এযে অমৃতেরি
মরণ হেথায় নাই ॥
অজ্ঞানেতে বলে সবে ভক্তি প্রেমের বাড়াবাড়ি থুই ॥

তিনটি চোরের গল্প শোন তিনটি গুণের কথা
পথিক জনের সকল কাড়ি দিলো অনেক ব্যাথা ॥
তম বলে মেরেই ফেলো রজ রাখে বাঁধি
সত্ত্ব তার বাঁধন খুলে পথ দেখালো সিধা ॥
সত্ত্বগুণও পারে না যে ঘরের কাছে নিতে
ঠাকুর বলেন প্রভুর কাছেই শেষের সাধন সাধা ॥